স্ফুলিঙ্গ

স্ফু লি ঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেলো
সেই তারি আনন্দ॥

স্ফুলিঙ্গ

১

অজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছ ঢাকা তুমি,
চিনিতে নারি প্রিয়ে !
কুহেলী আছে ঘিরি,
মেঘের মতো তাই
দেখিতে হয় গিরি।

২

অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়
গোলাপ উঠিল ফুটে—
'ভুলো না আমায়' বলিতে বলিতে
কখন পড়িল লুটে।

৬

অত্যাচারীর বিজয়তোরণ
ভেঙেছে ধুলার 'পর,
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর।

৪

অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে
প্রতিক্ষণে করিয়ো মার্জনা।

৫

অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ,
　　জীবন কেবলই খোঁজা।
অনেক বচন করেছি রচন,
　　জমেছে অনেক বোঝা।
যা পাই নি তারি লইয়া সাধনা
　　যাব কি সাগরপার ?
যা গাই নি তারি বহিয়া বেদনা
　　ছিঁড়িবে বীণার তার ?

৬

অনেক মালা গেঁথেছি মোর
কুঞ্জতলে,
সকালবেলার অতিথিরা
পরল গলে।
সন্ধেবেলা কে এল আজ
নিয়ে ডালা!
গাঁথব কি হায় ঝরা পাতায়
শুকনো মালা!

৭

অন্তরে মিলনপুষ্প
সৌন্দর্যে ফুটুক,
সংসারে কল্যাণ-ফলে
ফলিয়া উঠুক।

৮

অন্ধকার ভেদ করি
আসুক আলোক,
অন্ধতার মোহ হতে
আঁখি মুক্ত হোক।

অন্ধকারের পার হতে আনি
প্রভাত সূর্য মন্দ্রিল বাণী
জাগালো বিচিত্রেরে
এক আলোকের আলিঙ্গনের ঘেরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
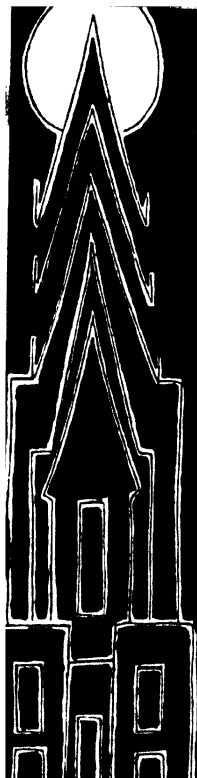
The Sun brings from across
the dark
the voice that awakens the Many
in the bosom of One Light.

Rabindranath Tagore

১

অন্ধকারের পার হতে আনি

প্রভাতসূর্য মন্দ্রিল বাণী,

জাগালো বিচিত্রেরে

এক আলোকের আলিঙ্গনের ঘেরে

১৩

অন্নহারা গৃহহারা চায় উর্ধ্ব-পানে,
ডাকে ভগবানে।
যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্যরূপে দয়ারূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে,
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,
হবে তার জয়।

১১

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে

১২

অপরাজিতা ফুটিল,
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে।

১৩

অপাকা কঠিন ফলের মতন,

কুমারী, তোমার প্রাণ

ঘন সংকোচে রেখেছে আগলি

আপন আত্মদান।

১৪

অবকাশপদ্মে বাণী
রচে পাদপীঠ।
সেই পদ্মে ছিদ্র রচে
তুচ্ছ বাক্যকীট।

১৫

অবসন্ন দিন তার

সোনার মুকুট ফেলে খুলে,

মাথা নত করে আসি

নীরবের মহাবেদীমূলে।

১৬

অবসান হল রাতি।
নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব-আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে—
এক পথে যারা চলিবে তাহারা
সকলেরে নিক চিনে।

১৭

অবুঝ, বুঝি মরিস খুঁজি
কোথায় দূর-পানে,
বাহিরে আঁখি বাঁধা—
বুকের মাঝে চাহিস না যে,
ঘুরিস কোন্‌খানে,
তাই তো লাগে ধাঁধা।

১৮

অবোধ হিয়া বুঝে’ না বোঝে,
করে সে একি ভুল—
তারার মাঝে কাঁদিয়া খোঁজে
ঝরিয়া-পড়া ফুল।

১৯

অমলধারা ঝরনা যেমন
স্বচ্ছ তোমার প্রাণ,
পথে তোমার জাগিয়ে তুলুক
আনন্দময় গান।
সম্মুখেতে চলবে যত
পূর্ণ হবে নদীর মতো,
দুই কূলেতে দেবে ভ'রে
সফলতার দান।

২০

অযতনে তব নিমেষকালের দান
পরশ করে যে আমার গভীর প্রাণ-
শরৎরাতের উল্কা যেন সে টুটে
রজনীর বুকে আগুন হইয়া উঠে।

২১

অরুন্ধতী পরুন ধুতি

বশিষ্ঠকে পরিয়ে দিয়ে শাড়ি।

জমদগ্নি অভিমানে

পাল্কি চ'ড়ে যান-না বাপের বাড়ি

২২

অলকায় অন্ত নাই
মানিক মোতির,
অরুচি হয়েছে তাই
অলকাপতির।
গলায় মালার তরে
মাগিয়াছে ফুল—
কাননের আদরিণী
এসো গো পারুল।

২৩

অসীম শূন্যে একা

অবাক্ চক্ষু

দূর-রহস্য-দেখা

২৪

অস্তরবিরে দিল মেঘমালা
আপন স্বর্ণরাশি,
উদিত শশীর তরে বাকি রহে
পাণ্ডুবরন হাসি।

২৫

অস্তাচলের প্রান্ত থেকে

তরুণ দলকে গেলেম ডেকে

উদয়পথের পানে—

ক্লান্ত প্রাণের প্রদীপশিখা

পরিয়ে দিবে আলোর টিকা

নূতন-জাগা প্রাণে।

২৬

আকাশ নিঠুর, বাতাস নীরস,

কৃপণ মাটির 'পরে

শিকড় হা হা করে—

চারি দিকে ফেটে চৌচির মাঠটা।

ফুলের খবর নিতে এলে

শোনায় নেহাত ঠাট্টা।

দখিন হাওয়া শুধায় যদি

'কেমন আছ' ব'লে,

শুকনো পাতায় খস্‌খসানি

কেবল জাগিয়ে তোলে

২৭

আকাশে ছড়ায়ে বাণী
অজানার বাঁশি বাজে বুঝি।
শুনিতে না পায় জন্তু,
মানুষ চলেছে সুর খুঁজি।

২৮

আকাশে বাতাসে ভাসে
অতলের নির্জনে নির্বাকে
গুপ্ত রহে, পাই নাকো ছুঁতে।
ছন্দের সংগীতে তারে
ধরিবারে কবি বসে থাকে
ধরা যাহা দেয় না কিছুতে।

২৯

আকাশে যুগল তারা
চলে সাথে সাথে
অনন্তের মন্দিরেতে
আলোক মেলাতে।

৩৮

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

৩১

আকাশের আলো মাটির তলায়

লুকায় চুপে,

ফাগুনের ডাকে বাহিরিতে চায়

কুসুমরূপে।

৩২

আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে

৩৩

আকাশের বাণী বাজে
বাতাসের বীণাতে—
মাধবীরে ডাক দিল
রবি-মুখ চিনাতে।
টুন্‌টুনি নেচে নেচে
দুলাইল লতাটি,
রবিরে শুনায়ে দিল
ধরণীর কথাটি।

৩৪

আগুন জ্বলিত যবে
আপন আলোতে
সাবধান করেছিল
মোরে দূর হতে।
নিবে গিয়ে ছাই-চাপা
আছে মৃতপ্রায়,
তাহারই বিপদ হতে
বাঁচাও আমায়।

৩৫

আগে যেথায় ভিড় জমত

মেলা

নানা-রকম চলত হাসি-

খেলা,

বিদায় নেবার সময় হলে

লাগত মনে ব্যথা,

‘এখন তবে যাই’ বলতে

বাধত মুখে কথা,

চোখের কোণে দেখেছিলেম

অশ্রুজলের ধারা—

করুণ রসের সেই পালাটা

এখন হল সারা।

আজ বুঝেছি সেটা কালের
ভ্রান্তি,
এখন যেটা প্রকাশ পেল
সেটাই শাস্তি শাস্তি।

৩৬

আজ গড়ি খেলাঘর,
কাল তারে ভুলি—
ধূলিতে যে লীলা তারে
মুছে দেয় ধূলি।

৩৭

আজি তোমাদের শুভপরিণয়-রাতে
সপ্ত ঋষির স্বর্গের আঙিনাতে
চিরমিলনের উজ্জ্বল শিখা
আশীর্বাদের মঙ্গললিখা
তারায় তারায় লিখিল দোঁহার তরে।
অরুন্ধতীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি
করি দিল আজ পুণ্যবৃষ্টি
প্রণতিনম্র যুগল ললাট-'পরে।
আজি নন্দনমন্দারবনে
রজনীগন্ধা-গন্ধের সনে
পৌঁছিল বুঝি মর্ত্যের হাসিখানি।
শচীর প্রেমের মধুরাগিণীতে
ধরার প্রেমের সাহানার গীতে
মিলায়ে বাজিল আলোকবীণার বাণী।

৩৮

আজি মানুষের সব সাধনার
কুৎসিত বিদ্রূপ
দিকে দিগন্তে করিছে প্রচার
দানবিকতার রূপ।
আমার আয়ুর প্রদোষগগনে
এ কুশ্রী বিভীষিকা
দেখিতে হবে কি দারুণ লগনে
জ্বালায় প্রলয়শিখা!

৩৯

আঁধার নিশার
গোপন অন্তরাল,
তাহারই পিছনে
লুকায়ে রচিলে
গোপন ইন্দ্রজাল

৪০

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
অযুত কোটি তারা
আপন কারাভবনে পাছে
আপনি হয় হারা।

৪১

আঁধারে ডুবিয়া ছিল যে জগৎ
আলোতে উঠিল ভেসে
অনাদি কালের তীর্থসলিলে
প্রাতঃস্নানের বেশে।

৪২

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক-লেখায়,
ছন্দের লীলা অচল মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা রূপের রেখায় রেখায়,
অতলের লীলা চপল তরঙ্গে।

৪৩

আপন শোভার মূল্য
পুষ্প নাহি বোঝে,
সহজে পেয়েছে যাহা
দেয় তা সহজে।

৪৪

আপনার রুদ্ধদ্বার-মাঝে

অন্ধকার নিয়ত বিরাজে।

আপন-বাহিরে মেলো চোখ,

সেইখানে অনন্ত আলোক।

৪৫

আপনারে তুমি লুকাবে কেমন ক'রে,
হে তাপসী বিভাবরী—
হেরো তারাগুলি তব নীরবতা ভ'রে
দিতেছে প্রকাশ করি।

৪৬

আপনারে দীপ করি জ্বালো,

আপনার যাত্রাপথে

আপনিই দিতে হবে আলো।

৪৭

আপনারে নিবেদন

সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে

সুন্দর তখনি মূর্তি লভে।

৪৮

আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে
গন্ধ তার ঢালে দখিনবায়ে।

৪৯

আমার আপন ভালো লাগায়
রচি আমার গান,
তুমি দিলে তোমার আপন
ভালো লাগার দান।
মোর আনন্দ এমনি ক'রে
নিলে আঁজল পেতে
আপন আনন্দেতে

৫০

আমি অতি পুরাতন,

এ খাতা হালের

হিসাব রাখিতে চাহে

নূতন কালের।

তবুও ভরসা পাই—

আছে কোনো গুণ,

ভিতরে নবীন থাকে

অমর ফাগুন।

পুরাতন চাঁপাগাছে

নূতনের আশা

নবীন কুসুমে আনে

অমৃতের ভাষা।

৫১

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই-যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুন-চৈত্র-রাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
ভাবী কালের হাতে।

৫২

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক-না লেখা—
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

৫৩

আয় রে বসন্ত, হেথা

কুসুমের সুষমা জাগা রে

শান্তিস্নিগ্ধ মুকুলের

হৃদয়ের গোপন আগারে।

ফলেরে আনিবে ডেকে

সেই লিপি যাস রেখে,

সুবর্ণের তূলিখানি

পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে।

৫৪

আলো আসে দিনে দিনে,

রাত্রি নিয়ে আসে অন্ধকার।

মরণসাগরে মিলে

সাদা কালো গঙ্গাযমুনার।

৫৫

আলো   এল যে দ্বারে তব

ওগো   মাধবীবনছায়া—

দোঁহে   মিলিয়া নব নব

তৃণে   বিছায়ে গাঁথো মায়া।

চাঁপা,   তোমার আঙিনাতে

ফেরে   বাতাস কাছে কাছে—

আজি   ফাগুনে এক-সাথে

দোলা   লাগিয়ো নাচে নাচে।

বধূ,   তোমার দেহলীতে

বর   আসিছে দেখিছ কি?

আজি   তাহার বাঁশরিতে

হিয়া   মিলায়ে দিয়ো সখী!

৫৬

আলো তার পদচিহ্ন
আকাশে না রাখে—
চলে যেতে জানে, তাই
চিরদিন থাকে।

৫৭

আলোর আশীর্বাদ জাগিল
তোমার সকাল বেলায়,
ধরার আশীর্বাদ লাগিল
তোমার সকল খেলায়,
বায়ুর আশীর্বাদ বহিল
তোমার আয়ুর সনে—
কবির আশীর্বাদ রহিল
তোমার বাক্যে মনে।

৫৮

আশার আলোকে

জ্বলুক প্রাণের তারা,

আগামী কালের

প্রদোষ-আঁধারে

ফেলুক কিরণধারা

৫৯

আসন দিলে অনাহূতে,
ভাষণ দিলে বীণাতানে—
বুঝি গো তুমি মেঘদূতে
পাঠায়েছিলে মোর পানে।
বাদল-রাতি এল যবে
বসিয়াছিনু একা-একা—
গভীর গুরু-গুরু রবে
কী ছবি মনে দিল দেখা।
পথের কথা পুবে হাওয়া
কহিল মোরে থেকে থেকে—
উদাস হয়ে চলে যাওয়া
খ্যাপামি সেই রোধিবে কে!
আমার তুমি অচেনা যে
সে কথা নাহি মানে হিয়া,

তোমারে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিয়া।
ফুলের ডালি কোলে দিনু—
বসিয়াছিলে একাকিনী।
তখনি ডেকে বলেছিনু :
তোমারে চিনি, ওগো, চিনি !

৬০

আসা-যাওয়ার পথ চলেছে
উদয় হতে অস্তাচলে,
কেঁদে হেসে নানান বেশে
পথিক চলে দলে দলে।
নামের চিহ্ন রাখিতে চায়
এই ধরণীর ধুলা জুড়ে,
দিন না যেতেই রেখা তাহার
ধুলার সাথে যায় যে উড়ে

৬১

ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই
যে আলোকে ভাইকে দেখিতে পায় ভাই।
ঈশ্বরপ্রণামে তবে হাত-জোড় হয়
যখন ভাইয়ের প্রেমে মিলাই হৃদয়।

৬২

উৎসবের রাত্রি-শেষে
মৃৎপ্রদীপ হায়
তারকার মৈত্রী ছেড়ে
মৃত্তিকারে চায়।

৬৩

ঊর্মি, তুমি চঞ্চলা

নৃত্যদোলায় দাও দোলা,

বাতাস আসে কী উচ্ছ্বাসে—

তরণী হয় পথ-ভোলা।

৬৪

এ অসীম গগনের তীরে
মৃৎকণা জানি ধরণীরে।

৬৫

এই যেন ভক্তের মন
বট অশ্বত্থের বন।
রচে তার সমুদার কায়াটি
ধ্যানঘন গম্ভীর ছায়াটি,
মর্মরে বন্দনমন্ত্র জাগায় রে
বৈরাগী কোন্ সমীরণ!

৬৬

এই সে পরম মূল্য

আমার পূজার—

না পূজা করিলে তবু

শাস্তি নাই তার।

৬৭

একদিন অতিথির প্রায়
এসেছিলে ঘরে,
আজ তুমি যাবার বেলায়
এসেছ অন্তরে।

৬৮

এক যে আছে বুড়ি
জন্মদিনে দিলেম তারে
রঙিন সুরের ঘুড়ি।
পাঠ্যপুঁথির পাতাগুলো
অবাক্ হয়ে রয়,
বৃদ্ধা মেয়ের উধাও চিত্ত
ফেরে আকাশ-ময়।
কণ্ঠে ওঠে গুন্‌গুনিয়ে
সারে গামা পাধা।
গানে গানে জাল বোনা হয়
ম্যাট্রিকের এই বাধা।

৬৯

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

৭০

এমন মানুষ আছে
পায়ের ধুলো নিতে এলে
রাখিতে হয় দৃষ্টি মেলে
জুতো সরায় পাছে

৭১

এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা,
চলে গেনু দিয়ে ভালোবাসা।

৭২

এসেছে প্রথম যুগে
প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসস্তূপ
পঙ্কিল ধরণীপৃষ্ঠে।
প্রাণের সে সন্দিগ্ধ স্বরূপ
সৃষ্টির তিমিররাত্রে।
ক্ষুদ্রতনু মানুষ তাহার
মনের আনিল দীপ্তি—
সংশয় ঘুচিল বিধাতার।

৭৩

‘এসো মোর কাছে’

শুকতারা গাহে গান।

প্রদীপের শিখা

নিবে চ’লে গেল,

মানিল সে আহ্বান।

৭৪

‘ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে’
কুঁড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে।
তারা বলে, ‘যে তোরে জাগায়
মোর জাগা ঘোচে তার পায়।’

৭৫

ওগো স্মৃতি, কাপালিকা,
বর্তমানের বলির রক্তে
অতীতের দাও টিকা।

৭৬

ওড়ার আনন্দে পাখি
শূন্যে দিকে দিকে
বিনা অক্ষরের বাণী
যায় লিখে লিখে।
মন মোর ওড়ে যবে
জাগে তার ধ্বনি,
পাখার আনন্দ সেই
বহিল লেখনী।

৭৭

কঠিন পাথর কাটি

মূর্তিকর গড়িছে প্রতিমা

অসীমেরে রূপ দিক্

জীবনের বাধাময় সীমা।

৭৮

কঠিন শিলা প্রতাপ তাঁর বহে,
তাহার কাছে পথিক সাবধান।
প্রীতি তাঁর কুসুমে ফুটে রহে,
অনাদরেও করে সে হাসি দান।

৭৯

কণ্ঠ ভরি নাম নিল
গান নিল মীরা,
কণ্ঠ হতে ফেলে দিল
মোতিমালা হীরা।
মুখে বাণী শুনি না যে,
মনে মনে সুর বাজে,
বাজে তার শিরা উপশিরা।
শান্তি তার দেহে মনে,
শান্তি তার দুনয়নে—
একতারা সংগীতে অধীরা।

৮০

'কথা চাই' 'কথা চাই' হাঁকে
কথার বাজারে ;
কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাজারে হাজারে।
প্রাণে তোর বাণী যদি থাকে
মৌনে ঢাকিয়া রাখ্‌ তাকে
মুখর এ হাটের মাঝারে।

৮১

কমল ফুটে অগম জলে,
তুলিবে তারে কেবা।
সবার তরে পায়ের তলে
তৃণের রহে সেবা।

কল্যাণপ্রতিমা শান্তা সেবা-সুধা-ভরা
লক্ষ্মী তুমি এ ধরায় দিয়েছিলে ধরা।
পূর্ণ করেছিলে গৃহ ভক্তি প্রীতি স্নেহে,
নিজেরে করেছ দান বাক্যে মনে দেহে।
যাঁর সেবা করেছিলে সংসারের কাজে
তাঁরই পূজা করো গিয়ে অনন্তের মাঝে।
পুণ্য হোক তব যাত্রা, শুভ হোক গতি,
অনন্তপিতার কোলে শান্তি পাও সতী!

৮৩

কল্লোলমুখর দিন

ধায় রাত্রি-পানে।

উচ্ছল নির্ঝর চলে

সিন্ধুর সন্ধানে।

বসন্তে অশান্ত ফুল

পেতে চায় ফল।

স্তব্ধ পূর্ণতার পানে

চলিছে চঞ্চল।

৮৪

কহিল তারা, 'জ্বালিব আলোখানি।
আঁধার দূর হবে না-হবে,
সে আমি নাহি জানি।'

৮৫

কাছে থাকি যবে
ভুলে থাকো,
দূরে গেলে যেন
মনে রাখো।

৮৬

কাছের রাতি দেখিতে পাই
মানা।
দূরের চাঁদ চিরদিনের
জানা।

৮৭

কাঁটার সংখ্যা

ঈর্ষাভরে

ফুল যেন নাহি

গণনা করে।

৮৮

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

৮৯

কী পাই, কী জমা করি,
কী দেবে, কে দেবে—
দিন মিছে কেটে যায়
এই ভেবে ভেবে।
চ'লে তো যেতেই হবে—
'কী যে দিয়ে যাব'
বিদায় নেবার আগে
এই কথা ভাবো।

৯০

কী যে কোথা হেথা-হোথা যায় ছড়াছড়ি,
কুড়িয়ে যতনে বাঁধি দিয়ে দড়াদড়ি।
তবুও কখন শেষে
বাঁধন যায় রে ফেঁসে,
ধুলায় ভোলার দেশে
যায় গড়াগড়ি—
হায় রে, রয় না তার দাম কড়া কড়ি।

৯১

কী সুর তুমি জাগালে উষা

কনকবীণাতারে—

নবজীবনলহরী উঠে

সুপ্তিপারাবারে।

৯২

কীর্তি যত গড়ে তুলি

ধূলি তারে করে টানাটানি।

গান যদি রেখে যাই

তাহারে রাখেন বীণাপাণি।

৯৩

কুসুমের শোভা

কুসুমের অবসানে

মধুরস হয়ে

লুকায় ফলের প্রাণে

৯৪

কোথায় আকাশ

কোথায় ধূলি

সে কথা পরান

গিয়েছে ভুলি।

তাই ফুল খোঁজে

তারার কোণে,

তারা খুঁজে ফিরে

ফুলের বনে।

৯৫

কোথা আছ অন্যমনা ছেলে—

দুই চক্ষু পাখি-সম

দূর শূন্যে ওড়ে পাখা মেলে।

অদৃশ্য দেশের হাওয়া

কেন জানি তোমারে ভুলায়,

অকূল সমুদ্র-পারে

স্বপ্ন দিয়ে বাঁধিছ কুলায়।

৯৬

কোন্ খ'সে-পড়া তারা
মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজি
সুরের অশ্রুধারা।

৯৭

ক্লান্ত মোর লেখনীর
এই শেষ আশা—
নীরবের ধ্যানে তার
ডুবে যাবে ভাষা।

৯৮

ক্ষণকালের গীতি
চিরকালের স্মৃতি।

৯৯

ক্ষণিক ধ্বনির স্বত-উচ্ছ্বাসে
সহসা নির্ঝরিণী
আপনারে লয় চিনি।
চকিত ভাবের ক্বচিৎ বিকাশে
বিস্মিত মোর প্রাণ
পায় নিজ সন্ধান।

১০০

ক্ষুদ্র-আপন - মাঝে

পরম আপন রাজে,

খুলুক দুয়ার তারই।

দেখি আমার ঘরে

চিরদিনের তরে

যে মোর আপনারই।

১০১

ক্ষুভিত সাগরে নিভৃত তরীর গেহ,
রজনী দিবস বহিছে তীরের স্নেহ।
দিকে দিকে যেথা বিপুল জলের দোল
গোপনে সেথায় এনেছে ধরার কোল।
উত্তাল ঢেউ তারা যে দৈত্য-ছেলে
পুত্তলী ভেবে লাফ দেয় বাহু মেলে।
তার হাত হতে বাঁচায়ে আনিলে তুমি,
ভূমির শিশুরে ফিরে পেল পুন ভূমি।

১০২

খাতা-ভরা পাতা তুমি
ভোজে দিলে পেতে,
আমারে ধরেছ এসে
দিতে হবে খেতে।
ভাঁড়ার হয়েছে খালি,
দই আর জলে
মিশাল ক'রে যা হয়
কী তাহারে বলে?
ক্ষুধিতেরে ফাঁকি দেওয়া
ছিল না ব্যাবসা,
বিধাতা দিয়েছে ফাঁকি
তাই এই দশা।

১০৩

গত দিবসের ব্যর্থ প্রাণের
যত ধুলা, যত কালি,
প্রতি ঊষা দেয় নবীন আশার
আলো দিয়ে প্রক্ষালি।

১০৪

গাছ দেয় ফল

ঋণ ব'লে তাহা নহে

নিজের সে দান

নিজেরই জীবনে বহে।

পথিক আসিয়া

লয় যদি ফলভার

প্রাপ্যের বেশি

সে সৌভাগ্য তার।

১০৫

গাছগুলি মুছে-ফেলা,
    গিরি ছায়া-ছায়া—
মেঘে আর কুয়াশায়
    রচে একি মায়া।
মুখ-ঢাকা ঝরনার
    শুনি আকুলতা—
সব যেন বিধাতার
    চুপিচুপি কথা।

১০৬

গাছের কথা মনে রাখি,
ফল করে সে দান।
ঘাসের কথা যাই ভুলে, সে
শ্যামল রাখে প্রাণ।

১০৭

গাছের পাতায় লেখন লেখে
বসন্তে বর্ষায়—
ঝ'রে পড়ে, সব কাহিনী
ধুলায় মিশে যায়।

১০৮

গানখানি মোর দিনু উপহার—
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে,
নিয়ো তবে মোর নামখানি বাদ দিয়ে

১০৯

গিরিবক্ষ হতে আজি

ঘুচুক কুজ্ঝটি-আবরণ,

নূতন প্রভাতসূর্য

এনে দিক্ নবজাগরণ।

মৌন তার ভেঙে যাক,

জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোক হতে

বাণীর নির্ঝরধারা

প্রবাহিত হোক শতস্রোতে।

১১০

গোড়াতেই ঢাক-

বাজনা—

কাজ করা তার

কাজ না।

১১১

গোঁড়ামি যখন সত্যেরে চাহে
যত্নে রাখিতে ধরি
মুঠির চাপনে ভীম উৎসাহে,
সত্য সে যায় মরি।[১]

১ পাঠভেদ : গোঁড়ামি সত্যেরে চায় মুঠায় রক্ষিতে—
যত জোর করে, সত্য মরে অলক্ষিতে।

১১২

ঘড়িতে দম দাও নি তুমি মূলে
ভাবিছ ব'সে, সূর্য বুঝি
সময় গেল ভুলে !

১১৩

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছে দুর্গমরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম—
নিকটে আসিনু, ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,
অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয়গৃহখানি।

১১৪

ঘনমেঘভার গগনতলে

বনে বনে ছায়া তারি—

একাকিনী বসি চোখের জলে

কোন্ বিরহিণী নারী।

১১৫

ঘরের মায়া ঘরের বাইরে করুক রূপরচনা,
বাইরের রসিক আনুক তার ফুলের মালা।
ঘরের বাণী ঘরের বাইরে বাজাক বাঁশি,
বাইরের উদাসী এসে দাঁড়াক তোমার আঙিনায়।
ঘরের হৃদয় ঘরের বাইরে পাতুক আসন,
সেই আসনে বাইরের পথিক এসে বসুক
ক্ষণকালের তরে।

১১৬

চরণে আপনারে
বরণ করি যবে
পাখিরা গেয়ে ওঠে
মধুরতম রবে—
মাটির তলে তলে
পুলক ধারা চলে,
নবীন আলো ঝলে
প্রভাত-উৎসবে।

১১৭

চলার গতি শেষের প্রতি
হোক-না অনুকূল।
পথের বোঁটা কঠিন অতি,
গৃহটি তার ফুল।
শমেতে এসে মিটুক মম
গানের যত ক্ষুধা।
কর্ম হোক পাত্র মম,
ধর্ম হোক সুধা।

১১৮

চলার পথের যত বাধা

পথবিপথের যত ধাঁধা

পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,

পথের বীণার তারে তারে

তারি টানে সুর হয় বাঁধা।

রচে যদি দুঃখের ছন্দ

দুঃখের-অতীত আনন্দ

তবেই রাগিণী হবে সাধা।

১১৯

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা—
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

১২০

চলে যাবে সত্তারূপ
    সৃজিত যা প্রাণেতে কায়াতে,
রেখে যাবে মায়ারূপ
    রচিত যা আলোতে ছায়াতে।

১২১

চাও যদি সত্যরূপে
দেখিবারে মন্দ—
ভালোর আলোতে দেখো,
হোয়ো নাকো অন্ধ।

১২২

চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী

চীন-লণ্ঠন দুলায়ে

চলেছ সাগরপারে।

আমি যে উদাসী একেলা প্রবাসী,

নিয়ে গেলে মন ভুলায়ে

দূর জানালার ধারে।

১২৩

চাঁদেরে করিতে বন্দী
মেঘ করে অভিসন্ধি,
চাঁদ বাজাইল মায়াশঙ্খ।
মন্ত্রে কালি হল গত,
জ্যোৎস্নার ফেনার মতো
মেঘ ভেসে চলে অকলঙ্ক।

১২৪

চারি দিকে বিবাদ বিদ্বেষ,

মনে হয় নাই তার শেষ।

ক্ষমা যদি চিত্তে রাখি, তবে

শান্তি লাভ হবে।

১২৫

চাষের সময়ে

যদিও করি নি হেলা,

ভুলিয়া ছিলাম

ফসল কাটার বেলা।

১২৬

চাহিছ বারে বারে

আপনারে ঢাকিতে—

মন না মানে মানা,

মেলে ডানা আঁখিতে।

১২৭

চাহিছে কীট মৌমাছির
পাইতে অধিকার—
করিল নত ফুলের শির
দারুণ প্রেম তার।

১২৮

চিত্ত মম বেদনা-দোলে
আন্দোলিত।

অঙ্গনের
সমুখ-পথে পান্থসখা
গিয়েছে বুঝি ক্লান্ত পায়ে
দিগন্তরে।

বিরহবেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দ বায়ে,
ছন্দে তারি কুন্দফুল
কাঁদিয়া ঝরে—

নবীণ তৃণ
শিহরি উঠে ক্ষণে ক্ষণে।

১২৯

চৈত্রের সেতারে বাজে
বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে উঠে
তরঙ্গ তাহার।

১৩০

চোখ হতে চোখে

খেলে কালো বিদ্যুৎ—

হৃদয় পাঠায়

আপন গোপন দূত।

১৩১

ছবির আসরে এল

কত রাজা কত মহারাজা

নানা অলংকারে সাজা।

অকুণ্ঠিত এলে দ্বারী-সাজে

সে-সবার মাঝে

তুমি প্রাণবান্—

তাদের সবার চেয়ে তোমার সম্মান।

১৩২

জন্মদিন আসে বারে বারে

মনে করাবারে—

এ জীবন নিত্যই নূতন

প্রতি প্রাতে আলোকিত

পুলকিত

দিনের মতন।

১৩৩

জন্ম দিল মুক্তিমন্ত্র,

সেই মন্ত্র অন্তরেতে ধরি

মৃত্যুর বন্ধন যত

পদে পদে দিব ছিন্ন করি।

১৩৪

জানার বাঁশি হাতে নিয়ে
না-জানা
বাজান তাঁহার নানা সুরের
বাজানা।

১৩৫

জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর,
প্রান্তর তব শান্ত,
পর্বত তব কঠিন নিবিড়,
কানন কোমল কান্ত।

১৩৬

জীবনদেবতা তব

দেহে মনে অন্তরে বাহিরে

আপন পূজার ফুল

আপনি ফুটান ধীরে ধীরে।

মাধুর্যে সৌরভে তারি

অহোরাত্র রহে যেন ভরি

তোমার সংসারখানি,

এই আমি আশীর্বাদ করি।

১৩৭

জীবনযাত্রা আগে চলে যায় ছুটে—
কালে কালে তার খেলার পুতুল
পিছনে ধুলায় লুটে।

১৩৮

জীবনযাত্রার পথে
    ক্লান্তি ভুলি, তরুণ পথিক,
        চলো নির্ভীক।
আপন অন্তরে তব
    আপন যাত্রার দীপালোক
        অনির্বাণ হোক।

১৩৯

জীবনরহস্য যায়

মরণরহস্য-মাঝে নামি,

মুখর দিনের আলো

নীরব নক্ষত্রে যায় থামি।

১৪০

জীবন সঞ্চয় করে

যা তাহার শ্রেয়—

মরণেরে পার হবে

এই সে পাথেয়।

১৪১

জীবনে তব প্রভাত এল
নব-অরুণকান্তি।
তোমারে ঘেরি মেলিয়া থাক্‌
শিশিরে-ধোওয়া শান্তি।
মাধুরী তব মধ্যদিনে
শক্তিরূপ ধরি
কর্মপটু কল্যাণের
করুক দূর ক্লান্তি।

১৪২

জীবনের দীপে তব

আলোকের আশীর্বচন

আঁধারের অচৈতন্যে

সঞ্চিত করুক জাগরণ।

১৪৩

জ্বালো নবজীবনের

নির্মল দীপিকা,

মর্তের চোখে ধরো

স্বর্গের লিপিকা।

আঁধারগহনে রচো

আলোকের বীথিকা,

কলকোলাহলে আনো

অমৃতের গীতিকা।

১৪৪

জ্বেলেছে পথের আলোক

সূর্যরথের চালক,

অরুণরক্ত গগন।

বক্ষে নাচিছে রুধির—

কে রবে শান্ত সুধীর?

কে রবে তন্দ্রামগন?

বাতাসে উঠিছে হিল্লোল,

সাগর-ঊর্মি বিলোল,

এল মহেন্দ্রলগন—

কে রবে তন্দ্রামগন?

১৪৫

ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে
তপ্তবারির স্রোতে—
গোপনে লুকানো অশ্রু কী লাগি
বাহিরিল এ আলোতে।

১৪৬

ডালিতে দেখেছি তব
অচেনা কুসুম নব।
দাও মোরে, আমি আমার ভাষায়
বরণ করিয়া লব।

১৪৭

ডুবারি যে সে কেবল
ডুব দেয় তলে।
যে জন পারের যাত্রী
সেই ভেসে চলে।

১৪৮

তপনের অরুণসারথি
শুভ্রদীপ্তিপারাবারে
লুপ্ত করে আপনারে
শেষ করি উষার আরতি।

১৪৯

তপনের পানে চেয়ে
সাগরের ঢেউ
বলে, 'ওই পুতলিরে
এনে দে-না কেউ।'

১৫০

তব চিত্তগগনের
　　দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে
　　পেয়েছে মহিমা।

১৫১

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলই লেখে,
মুছে বারে বারে।

১৫২

তরণী বেয়ে শেষে
এসেছি ভাঙা ঘাটে—
স্থলে না মেলে ঠাঁই,
জলে না দিন কাটে।

১৫৩

তরুণ প্রাণের যুগল মিলনে

পুণ্য অমৃত-বৃষ্টি

মঙ্গলদানে করুক মধুর

নবজীবনের সৃষ্টি।

প্রেমরহস্যসন্ধানপথে যাত্রী

মধুময় হোক তোমাদের দিন রাত্রি—

নামুক দোঁহার শুভদৃষ্টিতে

বিধাতার শুভদৃষ্টি।

১৫৪

তলোয়ার থাকে

সংক্ষেপে তার খাপে।

গদার গুরুতা

শুধু তার মোটা মাপে।

১৫৫

তারাগুলি সারারাতি
কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে
ফুটে বনময়।

১৫৬

তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ তোমার কণ্ঠে চাহে গাহিবারে
আপনারই গান।

১৫৭

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিত।
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার-জিত।
তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি সমে এসে—
চক্ররেখা পূর্ণ হল
আরম্ভে আর শেষে।

১৫৮

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

১৫৯

তৃতীয়ার চাঁদখানি বাঁকা সে

আপনারে চেয়ে দেখে— ফাঁকা সে।

তারাদের পানে চায়

বিদেশী জনের প্রায়,

জুড়ি না খুঁজিয়া পায় আকাশে।

১৬০

তোমাদের যে মিলন হবে
বিশ্বে হল জানাজানি—
তারাগুলি করছে কেবল
হাসাহাসি কানাকানি।
রাত্রি যখন গভীর হবে
বাসর-ঘরের বাতায়নে
মারবে ওরা উঁকি ঝুঁকি
—এইটে ওদের আছে মনে।

তোমরা যদি শোধ নিতে চাও,
এনেছি এই যন্ত্রখানি[১]—
ওরা কেন লুকিয়ে রবে
অন্ধকারের পর্দা টানি?

১ দূরবীক্ষণ

তোমরা কোণে দাঁড়িয়ে দেখো
আলোক-সভার মিলন-রাতি
দ্যুলোকেতে ভূলোকেতে—
হোক্-না আড়ি-পাতাপাতি।

১৬১

তোমার আমার মাঝে ঘন হল কাঁটার বেড়া এ
কখন্ সহসা রাতারাতি—
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিবে বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী!
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে কর দামী,
ঈশ্বরের কর অপমান—
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তান!
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্মধ্বজী দলে
ধিক্কারিবে তাহে ভয় নাই—
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে,
জানিব আমরা দোঁহে ভাই।

দুই হাত মেলে নাই   এতকাল ধ'রে তাই
বার বার বিধাতার দান
ব্যর্থ হল— অবশেষে   আশীর্বাদ কাছে এসে
অভিশাপে হল অবসান।
তবুও মানবদ্রোহে   স্পর্ধাভরে সমারোহে
চল যদি অন্ধতার পথে,
এই কথা জেনে যেয়ো   বাঁচাবে যে মূঢ়কেও
হেন শক্তি নাই এ জগতে।

শান্তিনিকেতন
১৩ ফাল্গুন ১৩৪৩

১৬২

তোমার দুটি হাতের সেবা

জানি নে মোরে পাঠালো কেবা

যখন হল দিনের অবসান।

দিবস যবে আলোক-হারা

তখন এল সন্ধ্যাতারা,

দিয়েছে তারে পরশসম্মান।[১]

১ স্বাক্ষরিত : বিক্রমজিৎ

১৬৩

তোমার মঙ্গলকার্য
তব ভৃত্য-পানে
অযাচিত যে প্রেমেরে
ডাক দিয়ে আনে,
যে অচিন্ত্য শক্তি দেয়,
যে অক্লান্ত প্রাণ,
সে তাহার প্রাপ্য নহে—
সে তোমারি দান।

১৬৪

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।
তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে—
অনেক দূরের থেকে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে—
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে।

১৬৫

তোমারে হেরিয়া চোখে,
মনে পড়ে শুধু এই মুখখানি
দেখেছি স্বপ্নলোকে।

১৬৬

দাত্থরে যে মনে ক'রে লিখেছ এ চিঠি

তাই ভাবি দাত্থতেও আছে কিছু মিঠি।

সেটা কি অহৈতুকী প্রীতি

অথবা চকোলেটের স্মৃতি—

এ কথাটা নয় খুব সোজা,

হয়তো বছর-কয় যাবে নাকো বোঝা।

তবু যদি লিখে রাখি তাহে ক্ষতি নেই

সংক্ষেপে এই—

ভিতরে এনেছ তুমি বিধাতার চিনি,

আমি সে বাহির হতে বাজারেতে কিনি।

১৬৭

দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা
মেঘের দলে জুটি
লিখে দিল— আজ ভুবনে
আকাশ-ভরা ছুটি।

১৬৮

দিগন্তে পথিক মেঘ
চ'লে যেতে যেতে
ছায়া দিয়ে নামটুকু
লেখে আকাশেতে।

১৬৯

দিগ্‌বলয়ে

নব শশীলেখা

টুক্‌রো যেন

মানিকের রেখা।

১৭০

দিনান্তে ধরণী যথা
চেয়ে থাকে স্তব্ধ অনিমিখে
নিশীথের সপ্তর্ষির দিকে,
জীবনের প্রান্ত হতে
তেমনি কি শান্ত তব চোখ
দেখিতেছে সুদূর আলোক ?

১৭১

দিনের আলো নামে যখন
　　ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
　　একলা দিঘির জলে।
তাকিয়ে থাকি, দেখি সঙ্গীহারা
　　একটি সন্ধ্যাতারা
ফেলেছে তার ছায়াটি এই
　　কমলসাগরে।

ডোবে না সে, নেবে না সে,
ঢেউ দিলে সে যায় না তবু স'রে—
যেন আমার বিফল রাতের
　　চেয়ে থাকার স্মৃতি

কালের কালো পটের 'পরে
রইল আঁকা নিতি।
মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ঐ যে ছায়াখানি।

১৭২

দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার
বহি কর্মভার।
দিনান্ত ভরিছে তরী রঙিন মায়ায়
আলোয় ছায়ায়।

১৭৩

দিবসরজনী তন্দ্রাবিহীন
মহাকাল আছে জাগি—
যাহা নাই কোনোখানে,
যারে কেহ নাহি জানে,
সে অপরিচিত কল্পনাতীত
কোন্ আগামীর লাগি।

১৭৪

দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ,
মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান

১৭৫

দুই প্রাণ মিলাইয়া
যে সংসার করিছ রচন,
তাহাতে সঞ্চিত হোক
নিখিলের আশীর্‌বচন।
ধ্রুব তারকার মতো
তোমাদের প্রেমের মহিমা
বিশ্বের সম্পদ হোক—
ছাড়ায়ে গৃহের ক্ষুদ্র সীমা।

১৭৬

দুঃখ এড়াবার আশা
নাই এ জীবনে।
দুঃখ সহিবার শক্তি
যেন পাই মনে।

১৭৭

দুঃখশিখার প্রদীপ জ্বেলে
খোঁজো আপন মন,
হয়তো সেথা হঠাৎ পাবে
চিরকালের ধন।

১৭৮

দুখের দশা শ্রাবণরাতি—
বাদল না পায় মানা,
চলেছে একটানা।
সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ
ক্ষণহাসির দূত।

১৭৯

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন,
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

১৮০

দূরের মানুষ কাছের হলেই
নতুন প্রাণের খেলা—
নতুন হাওয়ায় নতুন ঋতুর
ফুলের বসায় মেলা।

১৮১

দোয়াতখানা উলটি ফেলি

পটের 'পরে

'রাতের ছবি এঁকেছি' ব'লে

গরব করে।

১৮২

ধরণীর আঁখিনীর
মোচনের ছলে
দেবতার অবতার
বসুধার তলে।

১৮৩

ধরণীর খেলা খুঁজে
শিশু শুকতারা
তিমিররজনীতীরে
এল পথহারা।
উষা তারে ডাক দিয়ে
ফিরে নিয়ে যায়,
আলোকের ধন বুঝি
আলোকে মিলায়।

১৮৪

ধরার আঙিনা হতে ওই শোনো

উঠিল আকাশ-বাণী।

অমরলোকের মহিমা দিল যে

মর্ত্যলোকেরে আনি।

সরস্বতীর আসন পাতিল

নীল গগনের মাঝে

আলোকবীণার সভামণ্ডলে

মানুষের বীণা বাজে।

সুরের প্রবাহ ধায় সুরলোকে

দূরকে সে নেয় জিনি,

কবিকল্পনা বহিয়া চলিল

অলখ সৌদামিনী।

ভাষারথ ধায় পূবে পশ্চিমে

সূর্যরথের সাথে—

উধাও হইল মানবচিত্ত

স্বর্গের সীমানাতে।

১৮৫

ধরো হাল, বলরাম,

আনো তব মরু-ভাঙা হল।

বল দাও, ফল দাও,

স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।

১৮৬

নদী বহে যায় নূতন নূতন বাঁকে,
সাগর সমান থাকে।

১৮৭

নববর্ষ এল আজি

দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে ;

আনে নি আশার বাণী,

দেবে না সে করুণ প্রশ্রয়।

প্রতিকূল ভাগ্য আসে

হিংস্র বিভীষিকার আকারে ;

তখনি সে অকল্যাণ

যখনি তাহারে করি ভয়।

যে জীবন বহিয়াছি

পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা ;

দুর্দিনে নির্ভীক বীর্যে

শোধ করি তার শেষ দেনা।

১৮৮

নবমিলন-পূর্ণিমাতে
উর্মি উঠে উচ্ছলি,
সুরলোকের আশিস নামে
আলোকে তারে উজ্জ্বলি।
প্রেমারতির শঙ্খসম
ধ্বনিত করে চন্দ্রমা
নীরব রবে শুভোৎসবে
প্রজাপতির বন্দনা।

১৮৯

নবসংসার সৃষ্টির ভার
নতশিরে নিয়ো দুজনে,
মিলনাঞ্জলি যুগল হিয়ার
দিয়ো বিধাতার পূজনে।
কল্যাণদীপ জ্বালায়ো ভবনে,
বিশ্বেরে কোরো অতিথি—
মানবের প্রেমে জাগায়ো জীবনে
পুণ্য প্রেমের প্রতীতি।

১৯০

নয়ন-অতিথিরে

শিমুল দিল ডালি—

নাসিকা প্রতিবেশী

তা নিয়ে দেয় গালি।

সে জানে গুণ শুধু

প্রমাণ হয় ঘ্রাণে—

রঙ যে লাগে রূপে

সে কথা নাহি জানে।

১৯১

নয়নে নিঠুর চাহনি,

হৃদয়ে করুণা ঢাকা—

গভীর প্রেমের কাহিনী

গোপন করিয়া রাখা।

১৯২

না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়
পুরাতে পারো না তাও,
কেমনে বহিবে চাও যত কিছু
সব যদি তার পাও!

১৯৩

নানা বর্ণে রচি গেনু

সাহিত্যের ইন্দ্রধনুখানা—

কালক্রমে লুপ্ত হবে

আছে তাহা জানা।

কী তাহাতে ক্ষোভ?

হাতে যাহা মিলিবে না

কেন তাহে লোভ?

এই-যে সূর্যাস্ত-আভা

যে দিবস হারায় তাহারে

সেও তো আপনি ডোবে

রাত্রির আঁধারে।

এ বিচ্ছেদবেদনার ভাগী

অনিদ্রায় কোনোখানে

নাহি রহে জাগি—

আগে-ভাগে তারি লাগি দুঃখ
কিছুই-না'এর চেয়ে
ঢের বেশি সূক্ষ্ম।

১৯৪

নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার
অরুণকপোলতলে
রাতের বিদায়চুম্বনটুকু
শুকতারা হয়ে জ্বলে।

১৯৫

নিরুদ্যম অবকাশ শূন্য শুধু,
শান্তি তাহা নয়—
যে কর্মে রয়েছে সত্য
সে কর্মে শান্তির পরিচয়।

১৯৬

নিঃস্বতাসঙ্কোচে দিন
অবসন্ন হলে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা
নেয় তারে কোলে।

১৯৭

নূতন জন্মদিনে

পুরাতনের অন্তরেতে

নূতনে লও চিনে।

১৯৮

নূতন যুগের প্রত্যুষে কোন্
প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে—
যাবার লগ্ন, চলার চিন্তা
নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে।
নির্ঝর যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়া পড়্
দুঃসাহসের পথে,
বিঘ্নই তোর স্পর্ধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় ক'রে তবে জানিয়া লইবি।
অজানা অদৃষ্টেরে।

১৯৯

নূতন সংসারখানি সৃষ্টি করো আপন শক্তিতে
হৃদয়সম্পদ দিয়ে, হে শোভনা, স্নেহে ও ভক্তিতে
পুণ্যে ও সেবায়— থাকো লক্ষ্মীর আসনে শুভব্রতা
তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা
সুলগ্নে রোপিত হল —দেবতার প্রসাদবর্ষণ
নববর্ষাধরা-সাথে আজি তারা করুক গ্রহণ,
পূর্ণ হোক প্রেমরসে, মাধুর্যের ধরুক মঞ্জরী
চিরসুন্দরের দান, উঠুক সকল শাখা ভরি
বিশ্বের সেবার তরে সরস কল্যাণময় ফল—
বিস্তার করুক শান্তি স্নিগ্ধ তার শ্যামচ্ছায়াতল।

২০০

নূতন সে পলে পলে
অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান
সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে
নূতনের সুরা,
নবীনের চিরসুধা
তৃপ্তি করে পূরা।

২০১

পতিত ক্ষেতের ধূসরিত ভূমে

আগামী ফসল নিমগন ঘুমে,

আলোর আড়ালে ভূতলের নীচে

সোনার স্বপন অঙ্কুরিছে

মাটির মন্ত্রবলে।

সে মহামন্ত্র আশীর্বাদের

গোপনে লভিছে মন তোমাদের,

ভবিষ্যতের উদার আশার

সেই তো বাহন— পুণ্যভাষার

ধীরে ধীরে ফল ফলে।

মিলাইয়া হাত দেবে ও মানবে

একত্র হয়ে কাজ করি যবে

পৌরুষ তবে সার্থক হয়—

দেবতাপ্রসাদ নিজগুণে লয়—

জিৎ হয় মানবেরই।

আকাশের আলো বৃষ্টির জল

যত কেন নামে সবই নিষ্ফল—

নিজের শক্তি যদি না জাগাই

তবে কাঁটাগাছ আর আগাছাই

মাঠ বাট ফেলে ঘেরি।

২০২

পথে পথে অরণ্যে পর্বতে
চলিতে চলিতে হয় দেখা—
বিস্মৃতির পটভূমিকায়
স্মৃতি কিছু রেখে যায় রেখা।

২০৩

পথে যেতে যেতে হল পথিকের মেলা—

কিছু হল কথা আর কিছু হল খেলা।

তার পরে মিলে গেল দিগন্তের পারে

ছায়ার মতন একেবারে।

২০৪

পদ্মের পাতা পেতে আছে অঞ্জলি
রবির করের লিখন ধরিবে বলি।
সায়াহ্নে রবি অস্তে নামিবে যবে
সে ক্ষণলিখন তখন কোথায় রবে!

২০৫

পরিচিত সীমানার

বেড়া-ঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে ;

বিপুল অপরিচিত

নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে।

সেথাকার বাঁশিরবে

অনামা ফুলের মৃদুগন্ধে

জানা না-জানার মাঝে

বাণী ফিরে ছায়াময় ছন্দে।

২০৬

পশ্চিমে রবির দিন
হলে অবসান
তখনো বাজুক কানে
পুরবীর গান।

২০৭

পাখি যবে গাহে গান,
জানে না, প্রভাত-রবিরে সে তার
প্রাণের অর্ঘ্যদান।
ফুল ফুটে বনমাঝে—
সেই তো তাহার পূজানিবেদন
আপনি সে জানে না যে।

২০৮

পায়ে চলার বেগে

পথের-বিঘ্ন-হরণ-করা

শক্তি উঠুক জেগে।

২০৯

পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ, অজানা অক্ষরে
কত যুগযুগান্তের প্রভাতে সন্ধ্যায়
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত অনন্ত-অধ্যায়।
মহান সে গ্রন্থপত্র, তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে রাখিবে কি লিখে—
তব শৃঙ্গশিলাতলে দুদিনের খেলা,
আমাদের ক'জনের আনন্দের মেলা।

২১০

পুণ্যধারার অভিষেকবারি
শুভপরিণয়-'পরে
স্বর্গলোকের প্রসাদ আনুক
মর্ত্যযুগল-ঘরে।

২১১

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম নূতন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি 'পরে দিনরাতি
লেখে নানামত আপন নামের পাঁতি।
নূতনে পুরাণে মিলায়ে রেখার পাকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি আঁকে।

২১২

পুষ্পের মুকুল
নিয়ে আসে অরণ্যের
আশ্বাস বিপুল।

২১৩

পেয়েছি যে-সব ধন,

যার মূল্য আছে,

ফেলে যাই পাছে।

যার কোনো মূল্য নাই,

জানিবে না কেও,

তাই থাকে চরম পাথেয়।

২১৪

প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে ;
তৃণে তৃণে উষা সাজালো শিশিরকণা।
যারে নিবেদিল তাহারি পিপাসী কিরণে
নিঃশেষ হল রবি-অভ্যর্থনা।

২১৫

প্রথম আষাঢ়ে রামগিরি হতে
বহি আষাঢ়ের বাণী
গিয়েছিল দূত নীলঘন মেঘ
সে কথা সবাই জানি।
প্রথম আষাঢ়ে জোড়াসাঁকো হতে
মিলনের দূত চলে
পীতবাস-পরা নব রবিকর
প্রভাতগগনতলে।

২১৬

প্রদীপ থাকে সারাটা দিন
ঘরের এক কোণে—
সন্ধ্যাবেলা উঠিবে জাগি
শিখার চুম্বনে।

২১৭

প্রদোষের দেশে

আর ভালো লাগে না গো—

নবীন আলোতে

জাগো, মন, জাগো জাগো!

হারায়ো না মন

চিরস্বপনের লোকে

ছায়া-উপছায়া

জড়িত মুগ্ধ চোখে—

নবপ্রভাতের

পুণ্যপ্রসাদ মাগো।

২১৮

প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায়, মুছে ফেলে তায়—
আবার ফুটায়ে তুলে।

২১৯

প্রভাতের 'পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ—
নূতন জনমে নব নব দিন
তোমার জীবন করুক নবীন,
অমল আলোকে দূরে হোক লীন
রজনীর অবসাদ।

২২০

প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক

সুন্দর পরিমলে।

সন্ধ্যাবেলায় হোক সে ধন্য

মধুরসে-ভরা ফলে।

২২১

প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা যমুনা
মিলায়েছে দুই ধারা
সেখানে তোমার দেখেছিনু কী চেহারা!
দ্বিবেণী তোমারে নাম দিয়েছিনু
'দুই-বেণী' সোজাসুজি—
পিঠে নেমেছিল অচল ঝরনা বুঝি।

আজি একি দেখি! খোঁপায় তোমার
বাঁধিয়া তুলেছ বেণী—
চাঁদেরে মাগিয়া জমেছে মেঘের শ্রেণী।
এবার তোমার নামের বদল
না ক'রে উপায় নাই—
খোঁপা-গরবিণী খোবানি ডাকিব তাই।

২২২

প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে সঞ্চরে
শুভ্রতম তেজে,
পৃথিবীতে নামে সেই নানা রূপে রূপে
নানা বর্ণে সেজে।

২২৩

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

২২৪

প্রেয়সী মোর পুপে
তোমায় চুপে চুপে
ভালোবাসা দিয়ে গেলুম
গলার ভূষণ-রূপে।
কোনোদিন কী জানি
খুলবে হৃদয়খানি
সোনার স্মরণ দিয়ে গড়া
এই মায়া-কুলুপে।

২২৫

ফাগুন এল দ্বারে,

কেহ যে ঘরে নাই—

পরান ডাকে কারে

ভাবিয়া নাহি পাই।

২২৬

ফাগুন কাননে অবতীর্ণ,

ফুলদল পথে করে কীর্ণ।

অনাগত ফলে নাই দৃষ্টি,

নিমেষে নিমেষে অনাসৃষ্টি।

২২৭

ফিরে ফিরে আঁখিনীরে
পিছু-পানে চায়—
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে
চলা হল দায়।

২২৮

ফুল কোথা থাকে গোপনে,

গন্ধ তাহারে প্রকাশে।

প্রাণ ঢাকা থাকে স্বপনে,

গান যে তাহারে প্রকাশে।

২২৯

ফুল ছিঁড়ে লয় হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে পাওয়া—
আনমনে তার পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে যাওয়া।
যে সেই ধুলার ফুলে
হার গেঁথে লয় তুলে
হেলার সে ধন হয় যে ভূষণ
তাহারি মাথার চুলে।
শুধায়ো না মোর গান
কারে করেছিনু দান—
পথ-ধুলা-'পরে আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে মান।

২৩০

ফুলের অক্ষরে প্রেম
লিখে রাখে নাম আপনার—
ঝ'রে যায়, ফেরে সে আবার।

পাথরে পাথরে লেখা
কঠিন স্বাক্ষর দুরাশার
ভেঙে যায়, নাহি ফেরে আর।

২৩১

ফুলের কলিকা প্রভাতরবির
প্রসাদ করিছে লাভ,
কবে হবে তার হৃদয় ভরিয়া
ফলের আবির্ভাব।

২৩২

বইল বাতাস,

পাল তবু না জোটে—

ঘাটের ঘাণে

নৌকো মাথা কোটে।

২৩৩

‘বউ কথা কও’ ‘বউ কথা কও’
যতই গায় সে পাখি
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

২৩৪

বচন নাহি তো মুখে,
তবু মুখখানি
হৃদয়ের কানে বলে
নয়নের বাণী।

২৩৫

বড়ো কাজ নিজে বহে
 আপনার ভার।
বড়ো দুঃখ নিয়ে আসে
 সান্ত্বনা তাহার।
ছোটো কাজ, ছোটো ক্ষতি,
 ছোটো দুঃখ যত—
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ
 করে কণ্ঠাগত।

২৩৬

বড়োই সহজ
রবিরে ব্যঙ্গ করা,
আপন আলোকে
আপনি দিয়েছে ধরা।

২৩৭

বড়োর দলে নাই বা হলে গণ্য—

লোভ কোরো না লোকখ্যাতির জন্য।

ভালোবাসো, ভালো করো, প্রাণ মনে হও ভালো—

তবেই তুমি আলো পাবে তবেই দেবে আলো,

আপন-মাঝে আপনি হবে ধন্য।

স্বার্থমাঝে থেকো না অবরুদ্ধ—

লোভের সাথে নিয়ত করো যুদ্ধ।

নিজেরে যদি বিশ্বমাঝে করিতে পার দান

নিজেরে তবে করিবে লাভ, তখনি পাবে ত্রাণ—

হৃদয়ে মনে তখনি হবে শুদ্ধ।

নদীর জলে প্রবাহ হলে বন্ধ

তাহার দশা তখনি জেনো মন্দ।

দানের স্রোতে ছিল যে তার নিয়ত ত্রাণধারা—

হারায়ে ফেলি আপনা দিয়ে রচে আপন কারা,

অশুচি হয়ে রহে সে নিরানন্দ।

২৩৮

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনু রুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে—
ভ্রমরমুখরিত বকুলছায়ে
নূপুর-রুনু রুনু কাহার পায়ে।

২৩৯

বরষার রাতে জলের আঘাতে

পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া।

পরিমলে তারি সজল পবন

করুণায় উঠে ভরিয়া।

২৪০

বরষে বরষে শিউলিতলায়

ব'স অঞ্জলি পাতি,

ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি ;

এ কথাটি মনে জানো—

দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান,

মালার রূপটি বুঝি

মনের মধ্যে রবে কোনোখানে

যদি দেখ তারে খুঁজি।

সিন্ধুকে রহে বন্ধ,

হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও

পুরানো কালের গন্ধ।

২৪১

বর্ষণগৌরব তার
গিয়েছে চুকি,
রিক্তমেঘ দিক্‌প্রান্তে
ভয়ে দেয় উঁকি।

২৪২

বর্ষণশান্ত

পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত

বন ছাড়ি মনে এল নীপরেণুগন্ধ,

ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

২৪৩

বসন্ত, আনো মলয়সমীর,

ফুলে ভরি দাও ডালা—

মোর মন্দিরে মিলনরাতির

প্রদীপ হয়েছে জ্বালা।

২৪৪

বসন্ত, দাও আনি,

ফুল জাগাবার বাণী—

তোমার আশায় পাতায় পাতায়

চলিতেছে কানাকানি।

২৪৫

বসন্ত পাঠায় দূত
রহিয়া রহিয়া
যে কাল গিয়েছে তার
নিশ্বাস বহিয়া।

২৪৬

বসন্ত যে লেখা লেখে
 বনে বনান্তরে
নামুক তাহারই মন্ত্র
 লেখনীর 'পরে।

২৪৭

বসন্তের আসরে ঝড়
যখন ছুটে আসে
মুকুলগুলি না পায় ডর,
কচি পাতারা হাসে।
কেবল জানে জীর্ণ পাতা
ঝড়ের পরিচয়—
ঝড় তো তারি মুক্তিদাতা,
তারি বা কিসে ভয়।

২৪৮

বসন্তের হাওয়া যবে অরণ্য মাতায়
নৃত্য উঠে পাতায় পাতায়।
এই নৃত্যে সুন্দরকে অর্ঘ্য দেয় তার,
'ধন্য তুমি' বলে বার বার।

২৪৯

বস্তুতে রয় রূপের বাঁধন,
ছন্দ সে রয় শক্তিতে,
অর্থ সে রয় ব্যক্তিতে।

২৫০

বহিয়া কথার ভার
চলেছি কোথায় ;
পথে পথে খসে পড়ে
হেথায় হোথায়—
পথিকেরা কিছু কিছু
লয় তাহা তুলি ;
বাকি কত প'ড়ে থাকে,
লয় তাহা ধূলি।

২৫১

বহিয়া হালকা বোঝা

চলে যায় দিন তার,

অবকাশ দেয় না সে

কোনো দুশ্চিন্তার।

সম্বল কম বটে,

আছে বটে ঋণ-দায়—

অনুরাগ নেই তবু

ভাগ্যের নিন্দায়।

পাড়া-প্রতিবেশীদের

কটূতম ভাষ্যে

নীরব জবাব তার

স্মিত ঔদাস্যে।

জন্ম মুহূর্তেই
পেয়েছিল যৌতুক
ভাঙাচোরা জীবনের
বিদ্রূপে— কৌতুক।

২৫২

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥

৭ই পৌষ ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৫৩

বাউল বলে খাঁচার মধ্যে

আসে অচিন পাখি।

তেমনি, মনের পোড়ো বাসা

সেথায় করে যাওয়া-আসা

অচিন রূপের কোন্ রহস্য

ডাকি নাই-বা ডাকি।

২৫৪

বাক্য তোমার সব লোক বলে
গজদন্তের তুল্য—
বের হয়ে যদি ফিরিত কবলে
হারাতো সত্য মূল্য।
আঁখি-পানে তব তাকিয়েই
বিশ্বাস মনে রাখি এই
কথা দিলে তুমি ভোল না কখনো-
কত লোক কত ভুলল।

২৫৫

বাজে নিশীথের নীরব ছন্দে
বিশ্বকবির দান
আঁধার বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে
তারার বহ্নিগান।

২৫৬

বাণী আমার পাগল হাওয়ার
ঘূর্ণিধূলিতে
প্রাণের দোলে এলোমেলো
রয় গো ছুলিতে।
মৃত্যুলোকের অগাধ নদী
পার হয়ে সে ফেরে যদি
উল্টো স্রোতের সে দান ডালায়
পারবে তুলিতে।

২৫৭

বাতাস শুধায়, 'বলো তো, কমল,
তব রহস্য কী যে।'
কমল কহিল, 'আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে।'

২৫৮

বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি
খসায়ে ফেলিল যেই,
অমনি জানিয়ো, শাখায় গোলাপ
থেকেও আর সে নেই।

২৫৯

বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় তারা,
আঁধারেও পাই তবে
পথের কিনারা।
সুখ-অবসানে আসে
সন্তোগের সীমা,
দুঃখ তবে এনে দেয়
শান্তির মহিমা।

২৬০

বায়ু চাহে মুক্তি দিতে,
বন্দী করে গাছ—
দুই বিরুদ্ধের যোগে
মঞ্জরীর নাচ।

২৬১

বাহির হতে বহিয়া আনি
　　　সুখের উপাদান—
আপনা-মাঝে আনন্দের
　　　আপনি সমাধান।

২৬২

বাহিরে বস্তুর বোঝা,
ধন বলে তায়।
কল্যাণ সে অন্তরের
পরিপূর্ণতায়।

২৬৩

বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে
পেয়েছি ভাবিয়া হারায়েছি বারে বারে—
কত রূপে রূপে কত-না অলংকারে
অন্তরে তারে জীবনে লইব মিলায়ে,
বাহিরে তখন দিব তার সুধা বিলায়ে।

২৬৪

বাহিরের আশীর্বাদ
কী আনিব আমি—
অন্তরের আশীর্বাদ
দিন অন্তর্যামী।
পথিকের কথাগুলি
লভিবে পথের ধূলি—
জীবন করিবে পূর্ণ
জীবনের স্বামী।

২৬৫

বিকেলবেলার দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পুবগগনের দিগন্তে কি
জাগায় কোনো বোধ ?
লক্ষকোটি আলোবছর-পারে
সৃষ্টি করার যে বেদনা
মাতায় বিধাতারে
হয়তো তারি কেন্দ্র-মাঝে
যাত্রা আমার হবে—
অস্তবেলার আলোতে কি
আভাস কিছু রবে ?

২৬৬

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,

মঞ্জরী কাঁপে থরথর !

কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা

চুপিচুপি করে মরমর !

২৬৭

বিদায়-বেলার রবির পানে
বনশ্রী তার অর্ঘ্য আনে
অশোক ফুলের করুণ অঞ্জলি।

আভাস তারই রঙিন মেঘে
শেষ নিমেষে রইবে লেগে
রবি যখন অস্তে যাবে চলি।

২৬৮

বিদায়রথের ধ্বনি

দূর হতে ওই আসে কানে।

ছিন্নবন্ধনের শুধু

কোনো শব্দ নাই কোনোখানে।

২৬৯

বিধাতা দিলেন মান
বিদ্রোহের বেলা
অন্ধ ভক্তি দিনু যবে
করিলেন হেলা।

২৭০

বিপুল প্রস্তরপিণ্ড ভূস্তরের কণ্ঠ রুদ্ধ করি
ছিল যুগে যুগান্তরে অর্থহীন দিবা-বিভাবরী।
দীর্ঘ তপস্যার পরে ভাঙাইল প্রথম কুসুম
ধরণীর বাণীহারা ঘুম।

২৭১

বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুভ্রপ্রাণের গীতি।

২৭২

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠালো লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ বহিয়া সজল
বেদনা, বহিয়া তড়িৎচকিত
ব্যাকুল আকূতি। উৎসুক ধরা
ধৈর্য হারায়, পারে না লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে
বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
মুগ্ধ প্রলাপ— উল্লাস ভাসে
চামেলিগন্ধে পূর্ব গগনে।

২৭৩

বিশ্বের হৃদয়-মাঝে
কবি আছে সে কে!
কুসুমের লেখা তার
বার বার লেখে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা
বার বার মোছে,
অশান্ত প্রকাশব্যথা
কিছুতে না ঘোচে।

২৭৪

বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন

যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে

অবসরকালে বিনা প্রয়োজনে

সেই ছবি আমি আপনার মনে

করেছি অন্বেষণ।

২৭৫

বুদ্ধির আকাশ যবে সত্যে সমুজ্জ্বল,
প্রেমরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের ভূমি—
জীবনতরুতে ফলে কল্যাণের ফল,
মাধুরীর পুষ্পগুচ্ছে উঠে সে কুসুমি।

২৭৬

বেছে লব সব-সেরা,
ফাঁদ পেতে থাকি—
সব-সেরা কোথা হতে
দিয়ে যায় ফাঁকি।
আপনারে করি দান,
থাকি করজোড়ে—
সব-সেরা আপনিই
বেছে লয় মোরে।

২৭৭

বেদনা দিবে যত

অবিরত দিয়ো গো।

তবু এ ম্লান হিয়া

কুড়াইয়া নিয়ো গো।

যে ফুল আনমনে

উপবনে তুলিলে

কেন গো হেলাভরে

ধুলা-'পরে ভুলিলে।

বিঁধিয়া তব হারে

গেঁথো তারে প্রিয় গো।

২৭৮

বেদনার অশ্রু-উর্মিগুলি
গহনের তল হতে
রত্ন আনে তুলি।

২৭৯

ভজনমন্দিরে তব

পূজা যেন নাহি রয় থেমে,

মানুষে কোরো না অপমান।

যে ঈশ্বরে ভক্তি করো,

হে সাধক, মানুষের প্রেমে

তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ।

২৮০

ভয়ে ভয়ে এসেছিল
চেয়েছিল নাম—
মনে মনে হাসি আমি,
কী বা তার দাম।

২৮১

ভীরু প্রদীপেরে

ভরসা দিবার তরে

অসংখ্য তারা

রজনী জ্বালায়ে ধরে।

২৮২

ভুবন হবে নিত্য মধুর
    জীবন হবে ভালো,
মনের মধ্যে জ্বালাই যদি
    ভালোবাসার আলো।

২৮৩

ভেসে-যাওয়া ফুল

ধরিতে নারে,

ধরিবারই ঢেউ

ছুটায় তারে।

২৮৪

ভোরের কলকাকলিতে

মুখর তব প্রাণ

জাগাবে দিনসভাতলে

আলোর জয়গান।

২৮৫

ভোলানাথের খেলার তরে
খেলনা বানাই আমি।
এই বেলাকার খেলাটি তার
ওই বেলা যায় থামি।

২৮৬

ভ্রমণকারী মন,

ভ্রমণ করার তীর্থ তাহার

আপন ঘরের কোণ।

২৮৭

মনে রেখো, দৈনিক
চা খাইবে চৈনিক—
গায়ে যদি জোর পাও
হবে তবে সৈনিক।

জাপানিরা যদি আসে
চিঁড়ে নিক, দই নিক—
আধুনিক কবিদের
যত পারে বই নিক।

২৮৮

মনের আকাশে তার
দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগি স্বপনপাখি
চলিয়াছে ধেয়ে।

২৮৯

মরুতল কারে বলে ? সত্য যেথা
কুশ্রী বিভীষিকা,
সুন্দর সে মিথ্যা মরীচিকা।

২৯০

মর্তজীবনের
　　শুধিব যত ধার
অমর জীবনের
　　লভিব অধিকার।

২৯১

মাটি আঁকড়িয়া থাকিবারে চাই
তাই হয়ে যাই মাটি।
'রবো' ব'লে যার লোভ কিছু নাই
সেই রয়ে যায় খাঁটি।
পাহাড় যে সেও ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে মরে
কালের দীর্ঘশ্বাসে—
মুকুল কেবল যতবার ঝরে
ততবার ফিরে আসে।

২৯২

মাটিতে সে দুর্ভাগার
ভেঙেছে বাসা,
আকাশে সমুচ্চ করি
গাঁথিছে আশা।

২৯৩

মাটিতে মিশিল মাটি,
যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অনন্তের ধন।

২৯৪

মাঠে আছে কাঁচা ধান,
কাঁচা হাঁড়ি কুমোর-বাড়ি,
কাঁচা চুলো, ভিজে কাঠ—
পাত পাড়িয়ো না তাড়াতাড়ি।

২৯৫

মাধবী যায় যবে চলিয়া

বাতাসে শেষ কথা বলিয়া

কেহ না পারে তারে ধরিতে।

দাহন দানবের আকারে

যখন হানে বনশাখারে

দাগিয়া পীতরেখা হরিতে,

নিঠুর তপনের তাপনে

যখন পবনের কাঁপনে

বকুল ঝরি পড়ে ত্বরিতে,

তখন বলো কোন্ সাহসে

কে ভোলে আকাশের দাহ সে,

কে ছোটে বাঁচিতে কি মরিতে ?

কে চলে বাধাহীন চরণে

নবীন রসে রূপে বরনে

তাপিত ভুবনেরে বরিতে ?—

মুকুল সুকুমার সে যে গো,
মাধুরীরসে দেহ মেজে গো
বনের কোল আসে ভরিতে।

১১ চৈত্র ১৩৩৩

২৯৬

মাধবীর কানে কানে

বাতাস কহিল মৃদুরবে,

‘নিজেরে জানো না তুমি

তোমারে আমরা জানি সবে।’

২৯৭

মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টকপথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি।
রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।

২৯৮

মানুষেরে করিবারে স্তব
সত্যের কোরো না পরাভব।

২৯৯

মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী,
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণসহচরী ! অরুণ গগনের
ছিলি তো সোহাগিনী। শ্রাবণবরিষণে
মুখর বনভূমি তোমারই গন্ধের
গর্ব প্রচারিছে সিক্ত সমীরণে
দিশে দিশান্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া বাদল-রজনীতে
প্রভাত-আলোকেরে কহিলি, 'নহে নহে !'

৩০০

মিছে ডাকো— মন বলে, আজ না—

গেল উৎসবরাতি,

ম্লান হয়ে এল বাতি,

বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

সংসারে যা দেবার

মিটিয়ে দিনু এবার,

চুকিয়ে দিয়েছি তার খাজনা।

শেষ আলো, শেষ গান,

জগতের শেষ দান

নিয়ে যাব— আজ কোনো কাজ না।

বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

৩০১

মিলন-প্রভাতে দূরের মানুষ
আসিল নিকটে মম।
বিচ্ছেদ-রাতে দূরে চলে গিয়ে
হল সে নিকটতম।

৩০২

মিলন-যাত্রায় তব পরিপূর্ণ প্রেমের পাথেয়
থাকুক অক্ষয় হয়ে, নির্ভয় বিশ্বাসে তুমি যেয়ো
কল্যাণের পুণ্যপথে অম্লান নূতন প্রাণলোকে—
আপন সংসারখানি সৃষ্টি করো আনন্দ-আলোকে।

৩০৩

মিলন-সুলগনে,
কেন বল্‌,
নয়ন করে তোর
ছলছল্‌।
বিদায়দিনে যবে
ফাটে বুক
সেদিনও দেখেছি তো
হাসিমুখ।

৩০৪

মিলনের রথ চলে

জীবনের পথে দিনে রাতে,

বৎসরে বৎসরে আসে

কালের নূতন সীমানাতে,

চিরযাত্রী ঋতু যথা

বসন্তের আনন্দ মন্দিরে

ফাল্গুনে ফাল্গুনে আনে

মাধুরীর অর্ঘ্য ফিরে ফিরে।

৩০৫

মুকুলের বক্ষোমাঝে

কুসুম আঁধারে আছে বাঁধা,

সুন্দর হাসিয়া বহে

প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

৩০৬

মুক্ত যে ভাবনা মোর
ওড়ে উর্ধ্ব-পানে
সেই এসে বসে মোর গানে

৩০৭

মুহূর্ত মিলায়ে যায়

তবু ইচ্ছা করে—

আপন স্বাক্ষর রবে

যুগে যুগান্তরে।

৩০৮

মূর্ত তোরা বসন্তকাল মানব-লোকে
   সদ্যনবীন মাধুরীকে আনলি চোখে।
পুরোনোকে ঝরিয়ে দেওয়ার মন্ত্র সাধা—
   সরিয়ে দিলি জীবন-পথের জীর্ণ বাধা।
ফুল ফোটানোর আনন্দগান এলি শিখে—
   কোথা থেকে ডাক দিয়েছিস মৌমাছিকে!
চঞ্চল ওই নাচের ঘায়ে তরুণ তোরা
   উচ্ছলিয়া দিলি ধরার পাগলা-ঝোরা।
তাই আজি এই নব বরষ স্নেহভরে
   নবীন আশার বাহন তোদের আশিস্ করে।
মানব-গৃহে তোরা প্রাণের প্রথম বাণী
   স্বর্গ হতে কলভাষায় দিলি আনি।
মর্ত্য হতে যেন আবার দিনের শেষে
   স্বর্গ-পানে পূর্ণতর যায় ফিরে সে।

৩০৯

মৃতেরে যতই করি স্ফীত

পারি না করিতে সঞ্জীবিত।

৩১০

মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে
বাঁধে বৃক্ষটারে,
আকাশ আলোক দিয়ে
মুক্ত রাখে তারে।

৩১১

মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের
মূল্য দিতে হয়
সে প্রাণ অমৃতলোকে
মৃত্যু করে জয়।

৩১২

মেঘ আসে

নিয়ে তার জলভার,

যায় যবে

মুছে যায় স্মৃতি তার।

৩১৩

মেঘগুলি মোর
আঁধার আকাশে কাঁদে—
ভুলেছে তাহারা
আপনি রবিরে বাঁধে।

৩১৪

মৌমাছি সে মধু খোঁজে মাধবীর ঝোপে,
জমা করে ফোঁটা ফোঁটা মৌচাকের খোপে।
ক্ষুধা ভোলে, স্বার্থ ভোলে, লোভ নাহি করে—
যাহা জোটে দেয় তাহা সকলের তরে।

মানুষ মনের অন্ন খোঁজে বিশ্বময়—
যাহা পায় একা তাহা আপনারই নয়।
লোভ নাই, স্বার্থ নাই, জ্ঞানের ভাণ্ডার
ভরি তোলে—সবা লাগি মুক্ত তার দ্বার।

৩১৫

যখন গগনতলে
আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে উষা
চয়ন করিল তারাগুলি।

৩১৬

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
মনটা ছিল কেবল চলার পানে
বোধ হত তাই, কিছুই তো নাই কাছে—
পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
সমস্ত দিন চলেছি এক-রোখে।
দিনের শেষে পথের অবসানে
মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু-পানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে—
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।

৩১৭

যতক্ষণ থাকে মেঘ

শূন্যপটে নাম রহে লেখা।

যখন সে চলে যায়

মুছে দিয়ে যায় সব রেখা।

৩১৮

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে

সুদূর-আকাশে-আঁকা,

আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর

প্রজাপতিটির পাখা।

৩১৯

যদিও ক্লান্ত মোর দিনান্ত
রিক্ত আমার বল্লী,
তবুও পেয়েছি বনের প্রান্তে
একটি শীর্ণ মল্লি।
মোর দ্বারে যবে আনিয়াছ সাজি
স্নেহের আশিস্ এই লহো আজি—
যাবার ঘণ্টা ওই উঠে বাজি,
বিদায় হে গুরুপল্লী।

৩২০

যশের বোঝা তুলিয়া লয়ে কাঁধে
নামটা মোর মরে মরুক ঘুরে,
মনটা মোর যেন অপ্রমাদে
শান্ত হয়ে রহে অনেক দূরে।

৩২১

যা পায় সকলই জমা করে,
প্রাণের এ লীলা রাত্রিদিন।
কালের তাণ্ডবলীলাভরে
সকলই শূন্যেতে হয় লীন।

৩২২

যা রাখি আমার তরে

মিছে তারে রাখি,

আমিও রব না যবে

সেও হবে ফাঁকি।

যা রাখি সবার তরে

সেই শুধু রবে—

মোর সাথে ডোবে না সে,

রাখে তারে সবে।

৩২৩

যাওয়া-আসার একই যে পথ
জান না তা কি অন্ধ ?
যাবার পথ রোধিতে গেলে
আসার পথ বন্ধ।

৩২৪

যুগল প্রাণের মিলনের পরে
পুণ্য অমৃত-বৃষ্টি
মঙ্গল-দানে করুক মধুর
নবজীবনের সৃষ্টি।
প্রেমরহস্যসন্ধান-পথে যাত্রী
মধুময় হোক তোমাদের দিন রাত্রি,
নামুক দোঁহার শুভদৃষ্টিতে
বিধাতার শুভদৃষ্টি।

৩২৫

যুগল যাত্রী করিছ যাত্রা,

নূতন তরণীখানি—

নবজীবনের অভয়বার্তা

বাতাস দিতেছে আনি।

দোঁহার পাথেয় দোঁহার সঙ্গ

অফুরান হয়ে রবে—

সুখের দুখের যত তরঙ্গ

খেলার মতন হবে।

৩২৬

যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে
গিরি হয়ে যায় ঢিবি।
মরণে মরণে নূতন আয়ুতে
তৃণ রহে চিরজীবী।

৩২৭

যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়
সে আঁধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনায়।

৩২৮

যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।

৩২৯

যে ছবিতে ফোটে নাই
সবগুলি রেখা
সেও তো, হে শিল্পী, তব
নিজ হাতে লেখা।
অনেক মুকুল ঝরে,
না পায় গৌরব—
তারাও রচিছে তব
বসন্ত-উৎসব।

৩৩০

যে ঝুম্‌কোফুল ফোটে পথের ধারে
অন্যমনে পথিক দেখে তারে।
সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি
হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি।

৩৩১

যে তারা আমার তারা
সে নাকি কখন্ ভোরে
আকাশ হইতে নেমে
খুঁজিতে এসেছে মোরে।
শত শত যুগ ধরি
আলোকের পথ ঘুরে
আজ সে না জানি কোথা
ধরার গোধূলিপুরে।

৩৩২

যে ফুল এখনো কুঁড়ি
তারি জন্মশাখে
রবি নিজ আশীর্বাদ
প্রতিদিন রাখে।

৩৩৩

যে বন্ধুরে আজও দেখি নাই
তাহারই বিরহে ব্যথা পাই।

৩৩৪

যে ব্যথা ভুলিয়া গেছি,
পরানের তলে
স্বপনতিমিরতটে
তারা হয়ে জ্বলে।

৩৩৫

যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস
ভাষা তার নাই, আছে দীর্ঘশ্বাস।
সে যেন রাতের আঁধার দ্বিপ্রহর—
পাখি-গান নাই, আছে ঝিল্লিস্বর।

৩৩৬

যে যায় তাহারে আর
ফিরে ডাকা বৃথা।
অশ্রুজলে স্মৃতি তার
হোক পল্লবিতা।

৩৩৭

যে রত্ন সবার সেরা
তাহারে খুঁজিয়া ফেরা
ব্যর্থ অন্বেষণ।
কেহ নাহি জানে, কিসে
ধরা দেয় আপনি সে
এলে শুভক্ষণ।

৩৩৮

রক্তকরবী শ্বেত করবীর
কাছে আসি
ভিন্ন ভাষায় দুজনে করিছে
হাসাহাসি।

৩৩৯

রজনীগন্ধা পুষ্পদণ্ড
উঠিছে দীর্ঘদেহে,
অন্তরমাঝে নম্রতা তার
আছে নির্মল স্নেহে।

৩৪০

রজনী প্রভাত হল—
পাখি, ওঠো জাগি,
আলোকের পথে চলো
অমৃতের লাগি।

৩৪১

রবির প্রথম স্বাক্ষর-করা বাণী
পূর্বগগনে অরুণ দিয়েছে আনি।
সোনার আভাসে তরুণ প্রাণের আশা
প্রভাত-আকাশে প্রকাশিল তার ভাষা

৩৪২

রাখি যাহা তার বোঝা
কাঁধে চেপে রহে।
দিই যাহা তার ভার
চরাচর বহে।

৩৪৩

রাতের বাদল মাতে
তমালের শাখে ;
পাখির বাসায় এসে
'জাগো জাগো' ডাকে !

৩৪৪

রুদ্র সমুদ্রের বক্ষ,

ক্ষুদ্র এ তরণীর কক্ষ—

স্থল হতে জলে জলে

বহন করিয়া চলে

সিন্ধু ও ধরণীর সখ্য

৩৪৫

রূপে ও অরূপে গাঁথা
এ ভুবনখানি—
ভাব তারে সুর দেয়,
সত্য দেয় বাণী।
এসো মাঝখানে তার,
আনো ধ্যান আপনার
ছবিতে গানেতে যেথা
নিত্য কানাকানি

৩৪৬

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্যমাঝে
অমল শুভ্রতার।

৩৪৭

রেণু কোথায় লুকিয়ে থাকে
ফুলের মধ্যখানে,
বাতাসেতে গন্ধ তাহার
ছড়ায় সুদূর-পানে।

৩৪৮

রৌদ্রী তপস্যার তাপে জ্বলন্ত বৈশাখে
মোর জন্ম রবি দৌত্যে যদি এনে থাকে
নব আলোকের লিপিখানি
সে মোর সৌভাগ্য ব'লে জানি।

৩৪৯

লুকায়ে আছেন যিনি
জীবনের মাঝে
আমি তাঁরে প্রকাশিব
সংসারের কাজে

৩৫০

লুপ্ত পথের পুষ্পিত তৃণগুলি
ঐ কি স্মরণমুরতি রচিলে ধূলি—
দূর ফাগুনের কোন্ চরণের
সুকোমল অঙ্গুলি !

৩৫১

লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে
দ্বিপদীর শ্লোক—
আকাশ প্রথম পদে
লিখিল আলোক,
ধরণী শ্যামল পত্রে
বুলাইল তুলি
লিখিল আলোর মিল
নির্মল শিউলি।

৩৫২

শকতিহীনের দাপনি

আপনারে মারে আপনি

৩৫৩

শক্তির সংঘাত-মাঝে বিশ্বে যিনি শান্ত যিনি স্থির,
কর্মতাপে মর্মদাহে তিনি দিন শান্তিসুধানীর।
সংসারের আবর্তনে নির্বিচল যে মঙ্গলময়,
দুঃখে-সুখে ক্ষতি-লাভে তিনি দিন ভয়হীন জয়।
বিশ্বের বৈচিত্র্য-মাঝে যিনি এক যিনি অদ্বিতীয়,
নিখিলেরে নিশিদিন ক'রে দিন আমাদের প্রিয়।
যে মহা-একের পানে বিশ্বপদ্ম উঠিছে বিকশি
তিনিই আমার পিতা—
বলো, মন, বলো 'পিতা নোঽসি'।

৩৫৪

শরতে শিশিরবাতাস লেগে
জল ভ'রে আসে উদাসী মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

৩৫৫

শাস্তা, তুমি শান্তিনাশের
ভয় দেখালে মোরে—
সই করা নাম করবে আদায়
ঝগড়া করার জোরে।
এই তো দেখি বঁটি হাতে
শিউলি-তলায় যাওয়া
আপনি যে ফুল ঝরিয়ে দিল
শরৎপ্রাতের হাওয়া।

৩৫৬

শাস্তি নিজ-আবর্জনা দূর করিবারে
ঝাঁট দিতে থাকে বেগে—
ঝড় কহে তারে।

৩৫৭

শিকড় ভাবে, 'সেয়ানা আমি,
অবোধ যত শাখা।
ধূলি ও মাটি সেই তো খাঁটি,
আলোকলোক ফাঁকা।'

৩৫৮

শিশির আপন বিন্দুর মাঝখানে
রবির জ্যোতিরে বিন্দু ব'লেই জানে।

৩৫৯

শিশির সে চিরন্তন
যদিও মিলায় মুহূর্তেই।
রাজকণ্ঠে মণিহার
আছে তবু নিত্যই সে নেই।

৩৬০

শীতের দুয়ারে বসন্ত যবে
আসে যায় দ্বিধাভরে
আমের মুকুল ছুটে চলে আসে—
ঝরে তার পথ-'পরে।

৩৬১

শূন্য ঝুলি নিয়ে হায়
ভিক্ষু মিছে ফেরে,
আপনারে দেয় যদি
পায় সকলেরে।

৩৬২

শূন্য পাতার অন্তরালে
লুকিয়ে থাকে বাণী,
কেমন করে আমি তারে
বাইরে ডেকে আনি।
যখন থাকি অন্যমনে
দেখি তারে হৃদয়কোণে,
যখন ডাকি দেয় সে ফাঁকি—
পালায় ঘোমটা টানি।

৩৬৩

শেষ বসন্তরাত্রে

যৌবনরস রিক্ত করিনু

বিরহবেদনপাত্রে।

৩৬৪

শৈশবে ছাদের কোণে
অলক্ষ্যে ছুটিত মায়ারথ—
যেথা মরীচিকাপুরে
গুপ্ত ছিল অদেখা পর্বত।
হারায়েছি সহজ সে পথ।
আজি এ তূলির মুখে আনি
অভিনব ভূগোলের
সৃষ্টির মায়াবী মন্ত্রখানি।

৩৬৫

শ্যামলঘন বকুলবন-

ছায়ে ছায়ে

যেন কী সুর বাজে মধুর

পায়ে পায়ে।

৩৬৬

শ্রাবণের কালো ছায়া

নেমে আসে তমালের বনে

যেন দিক্‌ললনার

গলিত-কাজল-বরিষনে।

৩৬৭

সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী,

মাছরাঙাটাই কলঙ্কিনী।

সবাই কলম ধার ক'রে নেন,

আমিই কেবল কলম কিনি।

৩৬৮

সখার কাছেতে প্রেম
　চান ভগবান,
দাসের কাছেতে নতি
　চাহে শয়তান।

৩৬৯

সংগীতের বাণীপথে

ছন্দে গাঁথা তব নমস্কৃতি—

জাগালো অন্তরে মোর

প্রেমরসে অভিষিক্ত গীতি।

বসন্তে কোকিল গাহে

অলক্ষিত কোন্ তরুশাখে—

দূর অরণ্যের পিক

সেই সুরে তারে ফিরে ডাকে।

৩৭০

সংসারেতে দারুণ ব্যথা
লাগায় যখন প্রাণে
'আমি যে নাই' এই কথাটাই
মনটা যেন জানে।
যে আছে সে সকল কালের,
এ কাল হতে ভিন্ন—
তাহার গায়ে লাগে না তো
কোনো ক্ষতের চিহ্ন।

৩৭১

সত্যেরে যে জানে, তারে
সগর্বে ভাণ্ডারে রাখে ভরি।
সত্যেরে যে ভালোবাসে
বিনম্র অন্তরে রাখে ধরি!

৩৭২

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথচাওয়া নয়নের বাণী।

৩৭৩

সন্ধ্যারবি মেঘে দেয়
নাম সই ক'রে।
লেখা তার মুছে যায়,
মেঘ যায় সরে।

৩৭৪

সফলতা লভি যবে
মাথা করি নত,
জাগে মনে আপনার
অক্ষমতা যত।

৩৭৫

সব-কিছু জড়ো ক'রে
সব নাহি পাই।
যারই মাঝে সত্য আছে
সব যে সেথাই।

৩৭৬

সব চেয়ে ভক্তি যার
অস্ত্রদেবতারে
অস্ত্র যত জয়ী হয়
আপনি সে হারে।

৩৭৭

সবিতার জ্যোতির্মন্ত্র
সাবিত্রী তাহারই নাম জানি।
সর্বলোকে আপনারে মুক্তি দাও
এই তার বাণী।

৩৭৮

সময় আসন্ন হলে

আমি যাব চলে,

হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে—

এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে

অনাগত বসন্তের

আনন্দের আশা রাখিলাম

আমি হেথা নাই থাকিলাম।

৩৭৯

সাত বর্ণ মিলে যথা
দেখা দেয় এক শুভ্র জ্যোতি,
সব বর্ণ মিলে হোক
ভারতের শক্তির সংহতি।

৩৮০

সারা রাত তারা
যতই জ্বলে
রেখা নাহি রাখে
আকাশতলে।

৩৮১

সিদ্ধিপারে গেলেন যাত্রী,
ঘরে বাইরে দিবারাত্রি
আস্ফালনে হলেন দেশের মুখ্য।
বোঝা তাঁর ঐ উষ্ট্র বইল,
মরুর শুষ্ক পথে সইল
নীরবে তার বন্ধন আর দুঃখ।

৩৮২

সীমাশূন্য মহাকাশে

দৃপ্ত বেগে চন্দ্র সূর্য তারা

যে প্রদীপ্ত শক্তি নিয়ে

যুগে যুগে চলে তন্দ্রাহারা,

মানবের ইতিবৃত্তে

সেই দীপ্তি লয়ে নরোত্তম

তোমরা চলেছ নিত্য

মৃত্যুরে করিয়া অতিক্রম।

৩৮৩

স্থখেতে আসক্তি যার

আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।

কঠিন বীর্যের তারে

বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।

৩৮৪

স্থনিবিড় শ্যামলতা
উঠিয়াছে জেগে
ধরণীর বনতলে
গগনের মেঘে।

৩৮৫

সুন্দরের অশ্রুজল দেখা দেয় যেই
করুণা জাগায় সহজেই।
উপেক্ষিত অসুন্দর যে বেদনা বহে
কোনো ব্যথা তার তুল্য নহে।

৩৮৬

সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে
মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া
সোনার খেয়ালে।

৩৮৭

সূর্য কখন্ আলোর তিলক

দিলেন তোমার ভালে

অজানা উষার কালে।

কিন্তু তোমারে ভিক্ষার মতো

দেন নাই তিনি ফুল,

তোমার আপন হৃদয়েতে ছিল

মাধুরীলতার মূল।

অরুণকিরণে ঝরিল করুণা,

বিকশিল মঞ্জরী—

দেবতা আপনি বিস্মিত হল

আপন মন্ত্র স্মরি।

৩৮৮

সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে অন্ধ হয়ে ভাই।

৩৮৯

সেই আমাদের দেশের পদ্ম
তেমনি মধুর হেসে
ফুটেছে, ভাই, অন্য নামে
অন্য সুদূর দেশে।

৩৭০

সেকালের জয় গৌরব খসি
ধুলায় হতেছে ধূলি।
একাল তা নিয়ে গড়িতেছে বসি
আপন খেলেনাগুলি।

৩৯১

সেতারের তারে

ধানশি

মিড়ে মিড়ে উঠে

বাজিয়া।

গোধূলির রাগে

মানসী

স্বরে যেন এল

সাজিয়া।

৩৯২

সোনায় রাঙায় মাখামাখি,
রঙের বাঁধন কে দেয় রাখি
পথিক রবির স্বপন ঘিরে।
পেরোয় যখন তিমিরনদী
তখন সে রঙ মিলায় যদি
প্রভাতে পায় আবার ফিরে।
অস্ত-উদয়-রথে-রথে
যাওয়া-আসার পথে পথে
দেয় সে আপন আলো ঢালি।
পায় সে ফিরে মেঘের কোণে,
পায় ফাগুনের পারুলবনে
প্রতিদানের রঙের ডালি।

৬৯৩

স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে, অচৈতন্য, যা রহে না জেগে,
ধূলিবিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে।
যে নদীর ক্লান্তি ঘটে মধ্যপথে সিন্ধু-অভিসারে
অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে।
নিশ্চল গৃহের কোণে নিভৃতে স্তিমিত যেই বাতি
নির্জীব আলোক তার লুপ্ত হয় না ফুরাতে রাতি।
পান্থের অন্তরে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে
জানে না সে আঁধারে মিশিতে।

৩৯৪

স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে,
ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা।
গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে
গভীরে খুঁজিতে নিজ সীমা।

৩৯৫

স্নিগ্ধ মেঘ তীব্র তপ্ত
আকাশেরে ঢাকে,
আকাশ তাহার কোনো
চিহ্ন নাহি রাখে।
তপ্ত মাটি তৃপ্ত যবে
হয় তার জলে
নম্র নমস্কার তারে
দেয় ফুলে ফলে।

৩৯৬

স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে

সে শুধু পথের, সে নহে ঘরের তরে।

তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি—

স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি।

৩৯৭

স্বর্গের চোখের জলে
ঝ'রে পড়ে বৃষ্টি,
হাজার হাজার হাসি
মর্ত্যে করে সৃষ্টি।

৩৯৮

স্মৃতি কাপালিনী পূজারতা, একমনা,
বর্তমানেরে বলি দিয়া করে
অতীতের অর্চনা।

৩৯৯

স্মৃতি সে যে নিশিদিন
বর্তমানেরে নিঃশেষ করি
অতীতের শোধে ঋণ।

৪০০

হাব্‌লুবাবুর মন পাব ব'লে
করি চকোলোট আমদানি।
আজ শুধু মোর নামখানা দিয়ে
সাজালেম তাঁর নামদানি।

৪০১

হাসিমুখে শুকতারা
লিখে গেল ভোররাতে
আলোকের আগমনী
আঁধারের শেষপাতে।

৪০২

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা
স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন,
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে
বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন,
সে তুষারনির্ঝরিণী
রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে
অন্তহীন আনন্দের গীতা।

৪০৩

হে উষা, নিঃশব্দে এসো,
আকাশের তিমিরগুণ্ঠন
করো উন্মোচন।

হে প্রাণ, অন্তরে থেকে
মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।

হে চিত্ত, জাগ্রত হও,
জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।

ভেদবুদ্ধি-তামসের
মোহযবনিকা, হে আত্মন্,
করো উন্মোচন।

৪০৪

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে,
‘ভালো বেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।’

৪০৫

হে পাখি, চলেছ ছাড়ি
তব এ পারের বাসা,
ও পারে দিয়েছ পাড়ি—
কোন্ সে নীড়ের আশা ?

৪০৬

হে প্রিয়, দুঃখের বেশে
আস যবে মনে
তোমারে আনন্দ ব'লে
চিনি সেই ক্ষণে।

৪১৭

৪০৭

হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে
পাতায় কুসুমে ডালে,
সেই বাণী মোর অন্তরে আসি
ফুটিতেছে সুরে তালে।

৪০৮

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার—
মর্ত্যের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।

৪০৯

হেথায় আকাশ সাগর ধরণী
কহিছে প্রাণের ভাষা,
এইখানে এসে হৃদয় আমার
পেয়েছে আপন বাসা।
লভেছি গভীর শান্তি,
দেখেছি অমৃতকান্তি
দুদিনে পেয়েছি চিরদিবসের
বন্ধুর ভালোবাসা।

৪১০

হেলাভরে ধুলার 'পরে
ছড়াই কথাগুলো।
পায়ের তলে পলে পলে
গুঁড়িয়ে সে হয় ধুলো।

—

স্ফুলিঙ্গ রবীন্দ্রনাথ-রচিত ছোটো কবিতা শ্লোক বা সদুক্তির সংকলন। রচনার বিষয় বা উপলক্ষ বহু এবং বিচিত্র। কবির পূর্বপ্রকাশিত 'লেখন' (কার্তিক ১৩৩৩), *FIREFLIES* (ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) ও *STRAY BIRDS* (১৯১৭) এই তিনখানি কাব্যের সহিত অনেকাংশে ইহার সাদৃশ্য বা সাজাত্য বর্তমান। তবে বিচিত্রতর বিষয় ও বৃহত্তর কালব্যাপ্তি থাকায়, কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে।

অনেক কবিতারই রচনাকাল জানা নাই, এজন্য কালক্রমে সাজানো যায় নাই। বিষয় তথা রচনারীতির বিচারে শ্রেণী-বিভাগ করাও সহজসাধ্য নয়। আর, প্রত্যেক রচনাটি স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করার পক্ষেও বিশেষ বাধা দেখা যায় না। এ-জন্যই স্ফুলিঙ্গের সব-ক'টি সংস্করণেই কবিতাগুলি সূচনার বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট। সূচনার প্রথম ছত্র বা পর-পর কয়েকটি

পদ মনে থাকিলেই যে-কোনো কবিতার সন্ধান মিলিবে। এজন্যই অপরিহার্যতা নাই পৃথক্ সূচীপত্রের।

১৩৫২ বৈশাখে প্রথমপ্রকাশকালে স্ফুলিঙ্গের কবিতা-সংখ্যা ছিল ১৯৮। ১৩৬৭ চৈত্রের রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি সংস্করণে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬০। আর, তাহারও পরে অন্যূন সওয়া দুই যুগ (২৭ বৎসর) অতীত হওয়ায় পরিবর্ধিত বর্তমান সংস্করণের শ্লোক বা কবিতা -সংখ্যা হইল—৪১০। নানা উপলক্ষে বহু-বিচিত্র প্রেরণায় এগুলি লেখা সে তো জানা আছে; হাস্য-পরিহাস-সূত্রে বা খেলাচ্ছলে কোনো কোনো কবিতা লেখেন নাই এমনও নয়; কদাচিৎ কোনো কবিতা নিরর্থকতার ধার ঘেঁষিয়াই রূপের অপরূপ সার্থকতায় পৌঁছিয়াছে (দ্রষ্টব্য সংখ্যা ২১, ২৮৭, ২৯৪, কিংবা ৩৬৭।

নানা রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে, পত্র-পত্রিকায়, কবির স্নেহভাজন অথবা আশীর্বাদপ্রার্থী নানাজনের সংগ্রহে যে-সব রচনা বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছিল এতদিন, নানা সময়ে তাহা সংকলন করেন ও প্রচার করেন শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীপুলিন-

বিহারী সেন, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে—তাহারই ফলে ইতিপূর্বে প্রচারিত হয় স্ফুলিঙ্গের দুইটি সংস্করণ আর বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণেই যে তাহার সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা তাহাও বলা চলিবে না বা বলা উচিত হইবে না।

স্ফুলিঙ্গের প্রথম সংকলন-কালে আর বর্তমানেও শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের যে-কয়টি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি আমরা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহা হইল—

৩৮৮ সংখ্যা॥ মুদ্রিত লেখন কাব্যের যে কপি কবি স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ বাংলায় ইংরেজিতে নানা যোগ-বিয়োগ সংশোধন (?) যেমন করিয়াছেন, অনেকগুলি নূতন লেখাও লিখিয়াছেন বাংলায়—তন্মধ্যে কোনো কোনো লেখা লেখন-ধৃত ইংরেজি লেখারই পরিপূরক বলা যায়।

২৪৮এ/বি॥ *FIREFLIES* কাব্যের যে দুই কপি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছেন পূর্বের মতো, অনেক ইংরেজি

লেখনের ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়াছেন বাংলায়— বিরল ক্ষেত্রে একই লিখনের পর পর তিনটি রূপান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন একই পৃষ্ঠায় / তন্মধ্যে একটিও তাঁহার অমনোনীত তাহা বলিবার উপায় নাই।

১৬৪ ॥ বড়ো আকারের Ghosh's Diary 1935। নৃত্য-নাট্য চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি রচনার ফাঁকে ফাঁকে স্ফুলিঙ্গের বিশেষ একটি কবিতার (অত্র সংখ্যা ৩৯২) সন্ধান পাই এই পাণ্ডু-লিপিতে।

৩৭৫ ॥ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা না হইলেও, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ স্বজন, শান্তিনিকেতনে ও নানা বিদেশ-ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গী ও একান্তসচিব শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর হাতে লেখা একখানি খাতা।

স্ফুলিঙ্গের বর্তমান সংস্করণের কোন্ কবিতা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলা চলিবে বর্তমান গ্রন্থের সংখ্যা-নির্দেশে।—

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ৩৮৮-ধৃত বর্তমান স্ফুলিঙ্গের ২৯, ৬১, ৬৬, ৭০, ২৬৯, ৩০৬, ৩২৭, ৩২৮ ও ৪১০। তন্মধ্যে ৬১ সংখ্যায় 'ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই' ইত্যাদি ২ ছত্র আর 'ঈশ্বর প্রণামে তবে হাতজোড়া হয়' ইত্যাদি শেষাংশ পাণ্ডুলিপিতে পৃথগ্‌ভাবে লেখা থাকিলেও, জানা যায়, দুটি একত্র ছাপা হয় রবীন্দ্রলেখাঙ্কন-রূপেই ২৬ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখের স্বদেশ পত্রে।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ২৪৮এ -ধৃত বর্তমান স্ফুলিঙ্গের ৩, ১৩, ২০, ২৪, ৭৫ / ৩৯৮ / ৩৯৯ (একই কবিতার তিনটি পাঠ এক পৃষ্ঠায় লেখা ; কোনোটি লাঞ্ছিত নয়), ৮৭, ৯৯, ১১১ (গোঁড়ামি বা *bigotry* সম্পর্কে কবি ধিক্‌কার দিয়াছেন লেখনে স্ফুলিঙ্গে ও *FIREFLIES* কাব্যে বহুবার, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে), ১২৭, ১৯৪, ২১৬, ২৫৭, ২৮১, ৩০১, ৩১০, ৩২৬, ৩৩৮, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬৮, ৩৯ ও ৩৯৪।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ২৪৮ বি -ধৃত স্ফুলিঙ্গের সংখ্যা ১০৬, ১৮১, ২২৬, ২৬০ ও ৩৩০।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ গ্রন্থে (আষাঢ় ১৩৪০), বিশেষতঃ উহার পরবর্তী সংস্করণে (কার্তিক ১৩৬৯) উপস্থাপিত প্রসঙ্গের আলোচনা-সূত্রে নানা সময়ে নানা নিবন্ধে অজস্র দৃষ্টান্তের যে মালা গাঁথিয়াছেন কবি— তাহার অধিকাংশই স্বতন্ত্র শ্লোক বা কবিতা রূপেও আদরণীয়— গ্রথিত হইয়াছে স্ফুলিঙ্গ গ্রন্থে। [সব যে মূল ছন্দ গ্রন্থ হইতে বা তাহার পরবর্তী সংস্করণ হইতে গৃহীত তা নয় / স্ফুলিঙ্গের প্রথম প্রকাশ, পুনরমুদ্রণ ও শতপূর্তি-সংস্করণ, সবই ছন্দের শেষোক্ত সংস্করণের পূর্বে।] তাহারও তালিকা দেওয়া চলে এখানে বর্তমান গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা -অনুযায়ী— ৪০, ৫৫, ৫৯, ৬২, ১১০, ১১৪, ১১৯, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৯১, ২২৫, ২২৭, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯, ২৪১, ২৪২, ২৪৫, ২৬৬, ২৭২, ২৮৩, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৯, ৩০৩, ৩১৫, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯১ ও ৪০২। বিশেষ পাঠভেদ আছে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত ১২৮-

সংখ্যক কবিতার ক্ষেত্রে; অনুরূপ কারণেই কিছু যে নাই অন্যত্র তাহাও নয়। স্ফুলিঙ্গ-ধৃত কোনো কোনো কবিতার পাঠ ছন্দোবিৎ প্রবোধচন্দ্র সেনের অভিমতে নিখুঁত মনে না হইলেও, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। যেমন, ২৪১ সংখ্যার কবিতায় 'ভয়ে দেয় উঁকি' ছন্দোদুষ্ট কেন হইবে যদি শ্রীযুক্ত দামোদর শেঠের 'তিন মোন প্রায় ওজন' (খাপছাড়া / এখনকার সঞ্চয়িতা) ক্ষমার্হ এমন-কি আদরণীয় হয়?[১]

১ 'ত্রুটি এ স্থলে কেবল নয়, অন্য কবিতাতেও রহিয়াছে মনে করা হয়। যেমন স্ফুলিঙ্গের দ্বাদশ সংখ্যা সম্পর্কে ছন্দের (১৩৬৯) '৫০৫' পৃষ্ঠার প্রথম পাদটীকার এই মন্তব্য: 'ছন্দধাঁধা'য় এটির যে 'আদর্শ' দেওয়া আছে, এটিকে সে-ভাবে সাজালে দাঁড়াবে এ-রকম—

ফুটিল অপরাজিতা, লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
লিপিকা পেয়েছে যেন আকাশের আপন অক্ষরে।

কথা এই যে, রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে (অভিজ্ঞান-সংখ্যা ২০) এরূপ তো পাওয়া যায় না আর আদৌ ছন্দধাঁধার ক্রীড়া কৌতুকেই রচিত এটি, তাহারও প্রমাণাভাব। কবির সেরূপ খোশ-খেয়ালের কিছু আভাস আছে আরো পরের কোনো কোনো কবিতায়। এ ক্ষেত্রে

পাণ্ডুলিপি ৩৭৫ হইতে লওয়া হইয়াছে যে কবিতাগুলি বর্তমান গ্রন্থে তাহাদের অভিজ্ঞান-সংখ্যা ১, ২, ৩২, ৩৯, ৭১, ৭৪, ৮১, ৮৫, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ১০১, ১১১, ১১২, ১২২, ১২৭, ১৩০, ১৪৫, ১৪৬, ১৭৪, '২৩১', ২৩২, ২৪৩, ২৪৪, ২৭৮, '৩০৯', ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৭২, ৪০৫ ও ৪০৭। বহু কবিতার পাঠভেদ দেখা যায় এই

কী লেখেন রবীন্দ্রনাথ তাহাই দ্রষ্টব্য, কী লিখিতে পরিতেন সে বিচার অনাবশ্যক। আর, ইহাও জানি মাত্রাবিন্যাসে প্রত্যাশিত ক্রম-ভঙ্গের এ দোষ বা গুণই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের আরো বহু কাব্যেই ছড়ানো আছে ; বেশি খুঁজিতে হয় কি ?—

কহিনু করি বিনতি (বিদায়-অভিশাপ)
না জানে অভিবাদন ('হিং টিং ছট্' সোনার তরী)
রহস্য আছে নীরব ('মৃত্যুর পরে' চিত্রা)
বর্বর মুখবিকারে ('জন্মদিন' সেঁজুতি)
মিটায়ে দিনু এবার (৩০০ সংখ্যা স্ফুলিঙ্গ)

এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যায়।

পাণ্ডুলিপিতে আর স্ফুলিঙ্গে, লেখনে, এমন-কি [২]কণিকায়। পূর্বপ্রচলিত বাংলা কবিতার যে রূপান্তর দেখা যায় এ খাতায়, কদাচিৎ অন্যত্র-দুর্লভ ইংরেজি ভাষান্তর, তাহারই কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক এ স্থলে।—

ফুলের কলিকা ইত্যাদি (২৩১) শ্লোকের এই পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠান্তর :

ফুলের কলিকা ফলের রসের মাঝে
আপনা সঁপিয়া গভীর গোপনে রাজে!

অতিথি ছিলাম যে বনে ইত্যাদি (২) লেখনে :

চাহিয়া প্রভাত-রবির নয়নে গোলাপ উঠিল ফুটে।
'রাখিব তোমায় চিরকাল মনে' বলিয়া পড়িল টুটে।

২ স্ফুলিঙ্গ-বহিঃস্থিত হইলেও উল্লেখ থাক্—'চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে, / কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।' ইহার রূপান্তর এই পাণ্ডুলিপিতে :

বিশ্বে ছড়ায় চাঁদ আলোরে
বক্ষে যতনে রাখে কালোরে।

কোথায় আকাশ কোথায় ধূলি (৯৪) ইহাই কি লেখনে :

জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা,

জানে না আকাশে আছে তারা।

চাহিছে কীট মৌমাছির (১২৭) লেখনে :

কীটেরে দয়া করিয়ো ফুল, সে নহে মধুকর।

প্রেম যে তার বিষম ভুল করিল জর্জর।

মৃতেরে যতই (৩০৯) লেখনে :

মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য,

মরণেরই শুধু ঘটে ততই বাহুল্য।

আর আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে :

মৃতের যতই বাড়াই মূল্য

হয় না সে তাহে প্রাণে প্রফুল্ল

মরণেরই শুধু ঘটে বাহুল্য।

ঝরনা উথলে (১৪৫) এই পাণ্ডুলিপিতে ইহার ভাষান্তর :

The spring comes out in hot gushes

from the heart of the earth—

the hidden store of tears seeks freedom
in the light.

লুপ্ত পথের (৩৫০) ইহারও ভাষান্তর :

In the deserted garden grass blossom flowers
hieroglyphics on Dust
speaking of tender foot falls
of some vanished April.

FIREFLIES (১৯২৮ ফেব্রুয়ারি) গ্রন্থের কোন্ সুভাষিত কী আকার লইয়াছে স্ফুলিঙ্গ-ধৃত বাংলা কবিতায় তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক আর বাংলা কবিতার সূচনা ও সংখ্যার সংকলনে—

20 গানখানি মোর ১০৮

22 ওগো স্মৃতি/স্মৃতি কাপালিনী/স্মৃতি সে যে
৭৫।৩৯৮।৩৯৯

24 ক্ষণিক ধ্বনির ৯৯

25 স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে ৩৯৪

[47 অরুচি ঘটে যে রে স্বর্গ-'পরে
দেবতা মানুষেরে ঈর্ষা করে।

—পাণ্ডুলিপি ৩৭৫]

৩ একই পৃষ্ঠায় নিঃসম্পর্কিত দুটি সুভাষিত। আমাদের লক্ষ্য প্রথমটি। বাংলা কবিতায় যুগ্ম পাঠ। কিছুটা তুলনীয় ইংরেজি গ্রন্থে যে দুটি সুভাষিত অন্য দুই পৃষ্ঠায়—46/62

ছবি ও কবিতার জুড়ি মিলাইয়া কবি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অভিনব সৃষ্টি— 'খাপছাড়া'। আর-কয়েকখানি গ্রন্থও রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত, যেমন—সে, বিচিত্রিতা।

রবীন্দ্রচিত্রের বহু পরিচিত আলবাম—'চিত্রলিপি'র দুই খণ্ড। নানা সময়ে নিজের আঁকা ছবির কবিতা-ভাষ্য যেগুলি লেখেন তিনি, কিছু পরিচিত আমাদের কিছু বা অপরিচিত। এরূপ কবিতা-ভাষ্যের বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে বর্তমান স্ফুলিঙ্গে। প্রথম-খণ্ড চিত্রলিপির কোন্ ছবির বাঙ্‌ময় ভাষ্য স্ফুলিঙ্গে গৃহীত কোন্ কবিতায়, তাহার তালিকা—

চিত্রলিপি-১ : চিত্র	স্ফুলিঙ্গ-ধৃত কবিতা	সংখ্যা
২	বাউল বলে খাঁচার মধ্যে	২৫৩
৩	পথে পথে অরণ্যে পর্বতে	২০২
৪	অসীম শূন্যে একা	২৩
৫	ভ্রমণকারী মন	২৮৬
১৪	বিস্মৃত যুগে	২৭৪
১৭	এসেছে প্রথম যুগে	৭২
১৮	বিপুল প্রস্তরপিণ্ড	২৭০

সকল ক্ষেত্রে ছবি ও কবিতার জোড় ভাঙা চলে না বলিয়াই,

স্ফুলিঙ্গে এরূপ কবিতার সংকলন সীমিত। কতকগুলি ছবির কবিতা-ভাষ্য কোন্ প্রেরণায় কিভাবে লেখা হয় তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে যুগপৎ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০, পৃ. ২৭১-৭৫) আর চতুর্থ সংখ্যা রবীন্দ্রবীক্ষায় (পৌষ ১৩৮৪। পৃ. ৫৯-৬১)— তন্মধ্যে শেষোক্ত পত্রিকায় কবিতাগুলি রবীন্দ্র-লেখাঙ্কনে মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবি-রূপেই ছাপা হইয়াছে। উভয় স্থলেই বহু তথ্য সংকলন-শেষে সংগৃহীত আছে ; রবীন্দ্রবীক্ষা-৪ -ধৃত "চিত্রলিপি" হইতে স্ফুলিঙ্গে লওয়া হইয়াছে—

সংখ্যা	পাঠ	অত্র সংখ্যা
২	শৈশবে ছাদের কোণে	৩৬৪
৩	দিনান্তে ধরণী যথা	১৭০
৫	বহিয়া হালকা বোঝা	২৫০

বিশ্বভারতী পত্রিকা হইতে গৃহীত (ইহারও রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বর্তমান শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে, যাহার অভিজ্ঞান-সংখ্যা ২৪০)—

৭	কোথা আছ অন্যমনা	৯৫
১২	সুন্দরের অশ্রুজল	৩৮৫
১৩	ছবির আসরে এল	১৩১
১৪	আঁধারে ডুবিয়া ছিল যে	৪১

কতক কবিতা বিশ্বভারতী পত্রিকা আর রবীন্দ্রবীক্ষা উভয় স্থলেই আছে— পাঠভেদ নাই বা যৎসামান্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক পত্রিকায় উল্লেখ দেখিতে পাইবেন—

স্ফুলিঙ্গ-ধৃত ১৭০ সংখ্যার লক্ষ্য 'ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি' আর ২৫০ সংখ্যার লক্ষ্য 'অতুল খুড়ো' খাপছাড়ার প্রথম আর চতুর্দশ কবিতার সামনা-সামনি রঙে রেখায় যাহাদের রূপ ফুটিয়াছে। কিন্তু কবিতা-ভাষ্যে চমৎকার-জনক পার্থক্য আছে খাপছাড়ায় আর স্ফুলিঙ্গে। হাস্যপরিহাসের চটুলতা একটুও নাই এখানে— কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম সহৃদয়তাই ব্যঞ্জিত হয় ছত্রে ছত্রে। স্ফুলিঙ্গের উল্লিখিত ৩৮৫ ও ১৩১ সংখ্যার লক্ষ্য জানা যায় যথাক্রমে—প্রচলিত 'সে' গ্রন্থেরই মলাটে যে

অপরূপ মুখখানি আঁকা ('সে' তো ?)[৪] আর পান্নারাম। দুজনের কেহই আমাদের অপরিচিত নয়।

সর্বশেষ কবিতাটি (স্ফুলিঙ্গ ৪১) লেখার উপলক্ষ জানা যায়— '১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ তারিখে দীর্ঘ মোহাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে সংজ্ঞালাভ করিবার পর কবি রোগশয্যার-পাশে-রাখা টেবিলের ভেনেস্তা-টপ'এর উপর এক ছবি আঁকেন' / কবিতায় তাহারই বাঙ্‌ময় রূপ।

স্ফুলিঙ্গের কতকগুলি রচনা বহু পূর্বের। যেমন, ক্ষণিকার পাণ্ডুলিপি হইতে সংখ্যা ২০৯, রচনার স্থান-কাল দার্জিলিং, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ / সংখ্যা ৩৭৪, রচনা ২৪ ফাল্গুন ১৩০৯। তাহা ছাড়া, সংখ্যা ৩৪, ২৭৬, ৩৭৬ ও ৪০৫—এগুলি লেখা হয় লণ্ডনের নার্সিং হোমে থাকিবার কালে ১৩২০ আষাঢ়ে ;

৪ সে'র মুখ যে অসুন্দর এ কথা অবশ্যই মানা গেল না। আশ্চর্য এই যে 'করুণ' গম্ভীর এই আত্মমুকুরে কবির স্নেহের ও আমাদের শ্রদ্ধা'র পাত্র যেন এক পরিচিত প্রিয়জনের ছায়াপাত হইয়াছে। কবি কি সচেতন ছিলেন এ বিষয়ে ?

আর দুইটি কেবল, সংখ্যা ১২১ ও ১৪৭, দেশে ফিরিবার সময় জাহাজে ১৩২০ আশ্বিনে। এই পর্যায়ভুক্ত চতুর্দশ মাত্রার দ্বিপদী যেগুলি, অধিকাংশই 'দ্বিপদী' নামে ১৩২০ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে মুদ্রিত ও লেখনে সংকলিত। হয়তো অনবধানেই প্রচারিত বা প্রকাশিত হয় নাই যেগুলি, তাহাদের স্থান হইল স্ফুলিঙ্গে।

স্ফুলিঙ্গে সংকলিত কবিতা শ্লোক সুভাষিত নানা উপলক্ষে নানা সময়ে লেখা হয়, তাই ভাবে ভাষায় রচনাশৈলীতে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। নির্বিশেষে সব রচনার উপলক্ষ যেমন জানা নাই, কতকগুলি রচনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো তথ্য অতঃপর সংকলিত হইল—

১। ইংরেজি ভাষান্তর -সহ এ কবিতা লিখিয়া দেন কবি শ্রীমতী মেই শান্ ফান্‌কে (Mei San Fan) ২০ মে ১৯২৬ তারিখে। ইহার ছবি ছাপা হয় লেখন গ্রন্থের রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি শোভন সংস্করণের মুখপাতে।

১০। ১৩৩৮ সনে বাংলার কয়েকটি জেলা বন্যা-বিধ্বস্ত হইলে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ -ত্রাণ সমিতির পক্ষ হইতে যে আবেদন প্রচার করা হয়, সেজন্য এই কবিতাটি লিখিত ১৮ ভাদ্র তারিখে। ঠাকুর-পরিবারের জমিদারিতেও বন্যাজনিত ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছিল; এজন্য পৃথক ভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে সেবাব্রতী কয়েকজন কর্মীকে পাঠানো হয়।

১১৩। কবি ১৯৩৩ ডিসেম্বরে হায়দ্রাবাদে গিয়া বান্-মোরা পল্লীতে কোহিস্থান নামক একটি গুহাবাসে থাকেন কয়েক দিন, সে সময়ে লেখা। ১৩৪৩ কার্তিকের স্বদেশ পত্রে প্রচারিত।

১৭৩। এটিতে সেঁজুতি কাব্যের 'প্রতীক্ষা' কবিতার বীজরূপ বা পূর্বাভাস রহিয়াছে বলা যায়।

১৯৮। ইহার গীতরূপ বর্তমান গীতবিতানে: ওরে নূতন যুগের ভোরে ইত্যাদি।

২২৯। মহুয়া কাব্যের উৎসর্গ-বাচন হিসাবে লেখা হইলেও, ব্যবহার করা হয় নাই সে বইয়ে।

১৮৪। বিশেষ উপলক্ষে কবির নিকট মঙ্গলবচন প্রার্থনা করেন ও লাভ করেন কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র ৫ অগস্ট্ ১৯৩৮ তারিখে।

৫২। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতু সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সূচনাতে-ই এই উদ্দীপনবাণী লাভ করেন ১২ অক্টোবর ১৯২২ তারিখে। আর, তেমনি—

১৮৫। এই আশীর্বচনও লাভ করেন লাঙল পত্রিকার পরিচালক-রূপে। ঐ সাময়িক পত্রের প্রচার ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ হইতে।

৬৭। জোড়াসাঁকোর বাটীতে রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'বিচিত্রা' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অতিথি-রূপে আসিয়া থাকেন ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেন জাপানি শিল্পী শ্রীযুক্ত আরাই কাম্পো (খৃষ্টীয় ১৮৭৯-১৯৪৫)। বিদায় সংবর্ধনা-কালে, ২৫ বৈশাখ ১৩২৫ তারিখে, শিল্পীকে তাঁহারই তুলি ধরিয়া এ কবিতা লিখিয়া দেন কবি।

৬৮। এ কবিতার লক্ষ্য যে কবির স্নেহের দৌহিত্রী

মীরাদেবীর কন্যা শ্রীমতী নন্দিতা, তাহা না বলিলেও হয়। রচনা ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ তারিখে।

১৬০। নাটোরের মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর বিবাহ-উপলক্ষে (বৈশাখ ১৩২১) এই কবিতা লিখিয়া একটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্র উপহার দেন কবি নবদম্পতিকে।

১৬২। কবির 'রোগশয্যায়' কাব্য উৎসর্গিত যাঁহাদের উদ্দেশে, বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মীর প্রতিমা মনে হইয়াছিল সেদিন যাঁহাদের, প্রতিমাদেবী বলেন— তাঁহাদের একজন কবির দৌহিত্রী নন্দিতা, আরেকজন শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর। এ কবিতা শেষোক্তের উদ্দেশে; তাই কবির স্বহস্তের লেখায় কবিতা-শেষে স্বাক্ষর : বিক্রমজিৎ। রচনা ৩ বৈশাখ ১৩৪৬।

১৬৬। মিষ্ট-মধুর এই কবিতা মৈত্রেয়ীদেবীর কন্যা মিঠুয়ার উদ্দেশে লেখা তাহা জানা যায় ১৩৪৭ বৈশাখের প্রবাসীতেও (পৃ. ২৭)— রচনার তারিখ ১৭।৩।১৯৪০।

২২১। এ কবিতার লক্ষ্য কবির আত্মীয়া লক্ষ্ণৌবাসিনী শ্রীমতী ইরা বড়ুয়া, রচনা ১৬।৩।১৯৪০ তারিখে।

২২৪। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা কবির স্নেহের পৌত্রী নন্দিনীর উদ্দেশে লেখা তাহা বলাই বাহুল্য —রচনাকাল ফাল্গুন বা চৈত্র ১৩৩২।

৪০০। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরের শিশু সন্তানের উদ্দেশে এই স্বাক্ষর-কবিতা।

২০১।২৩৭।২৯৫।৩০৮।৩১৪ সংখ্যা দিয়া সংকলিত সব-ক'টি কবিতায় কবিহৃদয়ের স্নেহ ও শুভেচ্ছার প্রকাশ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশে। রচনার উপলক্ষ হইল মৌচাক ও আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ হইতে আশীর্বচন-প্রার্থনা। ২৩৭ সংখ্যার রচনা ১৩২৯ চৈত্র বা ১৩৩০ বৈশাখে, কোথায় প্রকাশিত বা প্রচারিত জানা নাই। ৩০৮ সংখ্যার প্রচার আনন্দবাজারে। আর, বাকি কবিতাগুলি প্রচারিত মৌচাকে।

১১৫। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান বাঙালি

গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে 'ঘরের মায়া' নামে যে ত্রৈমাসিক পত্র প্রচারের সংকল্প-গ্রহণ ১৯৩৩ জানুয়ারিতে, তাহারই উদ্দেশে কবির এই আশীর্বচন গদ্যছন্দে।

১৬১। 'মুস্‌লিম স্টুডেণ্ট্‌স্‌ ফেডারেশন'এর ভ্রাম্যমাণ দল ২১ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিলে রবীন্দ্রনাথ সাদরে তাহাদের গ্রহণ করেন আর এই কবিতায় আপনার অকৃত্রিম উদ্‌বেগ ও মনোবেদনা আর হিতৈষণা প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য ১৩৪৩ চৈত্রের বুলবুল পত্রিকা।

৩৬৩ ও ৪০৮। প্রথমটি শান্তিনিকেতন আশ্রমে তদানীন্তন গ্রন্থাগারের দ্বিতলে অন্যতম আলেখ্য-লিখনের সূত্রে রচিত ১৩৩৪ বসন্তোৎসবের কাছাকাছি সময়ে আর দ্বিতীয়টির রচনা আশ্রমে কলাভবনের সংগ্রহ ও প্রদর্শন-শালা তথা মুখ্য সদন নন্দনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে—'নন্দন' নামকরণও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

২৬৭। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উদ্দেশে কলিকাতা হইতে ২৩ বৈশাখ ১৩৪৪ তারিখে শ্রীমতী সুফিয়া খাতুন কবিকে যে

সুন্দর কবিতা লিখিয়া পাঠান আলমোড়ায়, তাহারই উত্তরে এই কবিতা।

সংকলন-যোগ্য সব কবিতাই আবিষ্কৃত হইয়াছে বা স্থান লইয়াছে স্ফুলিঙ্গের বর্তমান সংস্করণে সে দাবি করা চলে না। বহুজনের বহুদিনের যত্নে ও সহযোগিতায় প্রথম সংকলন আর পর-পর দুইটি সংস্করণে ক্রমিক পুষ্টি ও পরিপূর্তি। প্রথমাবধি যাঁহাদের-কাছে কৃতজ্ঞতা-নিবেদনের বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে তাঁহারা হইলেন—

শ্রীঅমিয়কুমার সেন
শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীপুলিনবিহারী সেন
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও
শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

যাঁহারা নানা সময়ে নানা উপলক্ষে কবির লেখা সংগ্রহ করেন ও রক্ষা করেন সযত্নে, গোচরে আনেন সম্পাদক-গোষ্ঠীর, তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া গেল স্বতন্ত্রভাবে।

নবম কবিতার বিচিত্রিত প্রতিলিপি স্ফুলিঙ্গের শোভন-সংস্করণে মুদ্রিত হয় শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের সৌজন্যে। ২৫২-সংখ্যক কবিতার রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত (রচনার স্থান-কাল-যুক্ত) রবীন্দ্র-লেখাঙ্কন মুদ্রিত হইল শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে। ১৬২-সংখ্যক কবিতার মূল পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে। গ্রন্থের অনুচ্ছদ-চিত্রের পূর্ব পরিকল্পনা আচার্য নন্দলাল বসুর। মুখপত্র রূপে সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্রপ্রতিকৃতির শিল্পী শ্রীযুক্ত বোরিস জর্জিয়েভ। 'স্ফুলিঙ্গ' এই লেখাঙ্কন আর স্ফুলিঙ্গের প্রবেশক বহুবর্ণ চিত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের তাহা তো বলিতে হইবে না।

স্ফুলিঙ্গে সংকলিত নানা কবিতার প্রাপক, সংগ্রাহক ও প্রচারকদের নাম, যতদূর জানা গিয়েছে, অতঃপর মুদ্রিত হইল—

অণিমা দেবী
অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমলা রায়চৌধুরী
অনিলকুমার চন্দ

অমলিনা দেবী	অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অমিতা ঠাকুর	অমল গুপ্ত
অশোকা রায়	অমলচন্দ্র ভট্টাচার্য
আরতি দেবী	অমিয়কুমার সেন
ইন্দুমতী দেবী	অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
ইরা বড়ুয়া	অরুণকুমার চন্দ
ইষিতা দেবী	অসীম দত্ত
ঊষা মিত্র	আবুল মনস্থর এলাহিবখ্‌শ
এণা দেবী	এম. এ. আজম
কনক দেবী	কাজী নজরুল ইসলাম
কালীপ্রভা দত্ত	ক্ষিতীশ রায়
গৌরী দেবী	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চারুলতা সেন	জ্যোৎস্নানাথ বসু
ছায়া দেবী	নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জ্যোৎস্না সেন	নেপালচন্দ্র দাস
তপতী দেবী	প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

নন্দিতা দেবী
নন্দিনী দেবী
নলিনী নাগ
নিবেদিতা দেবী
নির্মলকুমারী মহলানবিশ
পারুল দেবী
পারুল ঠাকুর
প্রমীলা মিত্র
বিমলা দেবী
বীণাপাণি দেবী
বীণা সেন
বেলা দাসগুপ্ত
বেলা সেন
মমতা দাসগুপ্তা
মলিনা মণ্ডল
মায়া সেন

প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রদ্যোত সেনগুপ্ত
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্তী
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
বুদ্ধদেব বসু
যোগীন্দ্রনাথ রায়
লোকেন্দ্রনাথ পালিত
শান্তিদেব ঘোষ
শৈলজারঞ্জন মজুমদার
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সত্যজিৎ রায়
সমীর বাগচী
সলিলময় ঘোষ
সাগরময় ঘোষ

মীরা সান্যাল
মেই শান ফান
মৈত্রেয়ী দেবী
রত্নমালা চৌধুরী
রমা গুপ্ত
রেখা দাসগুপ্ত
রেখা সরকার
রেণু দেবী
রেবা মুখোপাধ্যায়
লীলা দাসগুপ্তা
লীলা নাগ
লীলা মজুমদার
সুফিয়া খাতুন
সুরভি দেবী
স্নেহলীলা গুপ্ত
স্নেহশোভনা রক্ষিত
স্নেহসুধা গুপ্ত

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
সুধীরচন্দ্র কর
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
হিমাংশুলাল সরকার

সংকলন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়

সম্পাদনা : শ্রীকানাই সামন্ত